একক ৫ ❑ পরিবেশ (Environment)

গঠন **(Structure)**

৫.১ ভূমিকা **(Introduction)**

৫.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৫.৩ পরিবেশ **(Environment)**

৫.৩.১ পরিবেশের অর্থ **(Meaning of Environment)**

৫.৩.২ পরিবেশের বৈশিষ্ট্য **(Characteristics of Environment)**

৫.৩.৩ পরিবেশের প্রকারভেদ **(Types of Environment)**

৫.৩.৪ পরিবেশের উপাদান **(Components of Environment)**

৫.৪ মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্বন্ধ **(Relation between man and Environment)**

৫.৫ পরিবেশগত অনুভূতি **(Environmental perception)**

৫.৬ শিশুর পরিবেশ **(Environment of child)**

৫.৬.১ শিশুর ধারণা **(Concept of child)**

৫.৬.২ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ **(Growth and Development of child)**

৫.৬.৩ শিশুর জীবনবিকাশের স্তর **(Development of stages of child)**

৫.৬.৪ শিশুর জীবন বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের ভূমিকা **(Role of heridity and environment in the development of child)**

৫.৬.৫ শিশুর জৈবিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা **(Role of environment on biological development of child)**

৫.৬.৬ শিশুর সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা **(Role of environment on social and cultural development of child)**

৫.৭ সারসংক্ষেপ **(Summary)**

৫.৮ অনুশীলনী **(Exercise)**

৫.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত **(Hints of answer to check your progress)**

৫.১ ভূমিকা (Introduction)

শিশু ও তার পরিবেশে (Child and his environment)

সভ্য ও সংস্কৃতিবান মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই চায় সুস্থ আর সুন্দর একটা সমাজ। আর এই সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে হলে চাই শিশুর মঙ্গল চিন্তা। এ কথা আজ সর্ব জন স্বীকৃত এবং মতবিরোধ হীন। আজকের এই সুস্থ ও সুন্দর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিশুই হল ভবিষ্যতের সুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। অথচ এই শিশুর জীবন অভিজ্ঞতা শুরু হয় অনেক ক্ষেত্রেই অসাম্য ও বঞ্চনার হাত ধরে। এই অসাম্য ও বঞ্চনার প্রথম অভিজ্ঞতা একটি শিশু লাভ করে তার নিজেরই পরিবারে, তার মা-বাবার চোখের সামনেই, তাদের অজ্ঞতার পরিবেশেই। আবার এই মানবশিশুই দ্বিতীয়বার বঞ্চনার স্বীকার হয় তার দ্বিতীয় গৃহ বা বিদ্যালয় পরিবেশে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দৃষ্টিভঙ্গি, অজ্ঞতা আর অ-সুখিত্বের জন্য শিশুকে নানা প্রতিকূল ও অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং একটি মানব শিশুর প্রথমে তার নিজ পরিবারে বা গৃহে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে অসাম্য ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় আর এই দুটি স্থানের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যেই ভাবীকালের নাগরিক, এই শিশুটির জীবনে সূত্রপাত ঘটে অসন্তোষ আর অতৃপ্তির জীবন।

এই অসুখী আর অতৃপ্তির যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করে শিশুকে তৃপ্ত ও সুখী মানুষ তৈরি করতে হলে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসতে হবে তার মা ও বাবাকে এবং তারপর শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। এই কাজ তাদের সম্পন্ন করতে হবে বিজ্ঞান সম্মতভাবে, স্নেহপূর্ণ হাত ধরে যথার্থ সন্তান পালনের মধ্য দিয়ে। এজন্য একদিকে যেমন জানা দরকার শিশুকে তেমনি অন্য দিকে তার পরিবেশকে।

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি শেষ করার পরে আপনি—

- পরিবেশের বিভিন্ন দিক জানতে পারবেন।
- পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারবেন।
- শিশুর পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে তার সম্পর্ক জানতে ও নির্ণয় করতে পারবেন।

৫.৩ পরিবেশ (Environment)

৫.৩.১ পরিবেশের অর্থ (Meaningof Environment) :

বাংলা 'পরিবেশ' শব্দটি দু'টি অংশের সমন্বয়ে গঠিত— 'পরি' এবং 'বেশ'। 'পরি' শব্দটি হল সম্যক বা ব্যাপ্তি সূচক একটি উপসর্গ (prefix) এবং 'বেশ' কথাটির অর্থ হল বেষ্টন, বেড় বা ঘিরে থাকা। সুতরাং

'পরিবেশ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় পরিবেষ্টন বা আবেষ্টন কিন্তু এই পরিবেষ্টন কার সাপেক্ষে? সমাজ বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় হয়, পরিবেষ্টন হল প্রধানত মানুষের— হয় ব্যক্তি মানুষের সাপেক্ষে অথবা গোষ্ঠী বা সমাজবদ্ধ মানুষের সাপেক্ষে।

আবার, 'পরিবেশ' কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'environment' ইংরেজি 'environment' শব্দটির মূলে রয়েছে ফরাসি শব্দ 'environ' যার অর্থ হল 'পার্শ্ববর্তী এলাকা' বা 'চারপাশ', ফরাসি ক্রিয়াপদ 'environer' এর অর্থ হল ঘিরে ফেলা। ইংরেজিতে 'environment' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'The surroundings' (The Concise Oxford Dictionary of Geography, Mayhew and Penny, 1992)।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় 'environment' হল, আমাদের চারপাশে যা অবস্থান করে তাই, অন্যভাবে বলা যায়, যে বাস্তব পরিধির ভেতরে আমরা বসবাস করি, সেই পরিধির অন্তর্গত বস্তুক্ষেত্র। বস্তুক্ষেত্র অর্থাৎ আমাদের বসবাসের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরে যেগুলি রয়েছে সেগুলি হল পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান। পরিবেশ বলতে কিন্তু এই উপাদানগুলির সমষ্টি নয়, উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথষ্ক্রিয়ার মিলিত এক সত্তা।

ইউনাইটেড নেশনস্ এনভাইরনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) পরিবেশের সংজ্ঞা দিয়েছে "পরিবেশ বলতে পরস্পর ক্রিয়াশীল উপাদানগুলির মাধ্যমে গড়ে ওঠাসেই প্রাকৃতিক ও জীবমণ্ডলীয় প্রণালীকে বোঝায় যার মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সজীব উপাদানগুলি বেঁচে থাকে, বসবাস করে।"

পরিবেশ বিজ্ঞানী বটকিন এবং কেলার ১৯৯৫ সালে তাঁদের 'Environment Science' নামক গ্রন্থে পরিবেশের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে "জীব, উদ্ভিদ বা প্রাণী তাদের জীবনচক্রের যে কোন সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কারণগুলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে।"

মনোবিদ উডওয়ার্থ-এর মতে "Environment covers all the outside factors that have acted on the individual since he began life." অর্থাৎ তাঁর মতে "পরিবেশ বলতে সকল বাহ্যিক উপাদানকে বোঝায় যেগুলি জীবনের শুরু থেকে শিশুর উপর ক্রিয়াশীল হয়।" এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, মনোবিদ্যায় পরিবেশকে নিষ্ক্রিয় কোন সত্তা হিসাবে নয়, তার সক্রিয় সত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধুনিক মনোবিদ্যায় বলা হয়েছে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে উত্তেজিত করতে সক্ষম এমন সমস্ত উদ্দীপকের সমবায়ই হল পরিবেশ।

মনোবিদ ডগলাস এবং হল্যান্ড এর মতে "The term environment is used to describe, in the aggregate, all the external forces influences and conditions which effect the life, nature, behaviour and the growth, development and maturity of the organism." এই সংজ্ঞা অনুযায়ী পরিবেশ হল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। পরিবেশের অন্তর্গত কোন বিশেষ বস্তু একজনের নিকট সক্রিয় উদ্দীপক হলেও অন্যজনের ক্ষেত্রে না-ও হতে পারে। সুতরাং পরিবেশের অন্তর্গত কোন বস্তুর কোন একজন ব্যক্তিকে উদ্দীপিত করতে সক্ষম হলে তবেই তা পরিবেশের অন্তর্গত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, শিশুর জীবন শুরু (ভ্রূণানু) হওয়ার পর থেকে যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমন্বয় শিশুর উপর ক্রিয়াশীল তাদের ঐক্যবদ্ধ সত্তাকেই বলা হয় পরিবেশ। শিক্ষাবিজ্ঞানে পরিবেশকে আরো ব্যাপক অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এক্ষেত্রে, পরিবেশ বলতে বোঝায় শিশুর পারিপার্শ্বিক সেই উদ্দীপক পরিস্থিতি যার প্রভাব শিশুর ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটায় এবং তার আচরণ ধারায় পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করে।

৫.৩.২ পরিবেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Environment) :

আমরা আগেই জেনেছি পরিবেশ শিশু বা ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশ সম্পর্কে আরো একটু জানার জন্য প্রয়োজন তার বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা। পরিবেশের বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে উল্লেখ করা হল :

১) সক্রিয়তা : পরিবেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তা সক্রিয় এবং ক্রিয়াশীল। শিশুর জগতে যা কিছু বিষয় শিশুকে বা ব্যক্তিকে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম তা সবই পরিবেশের উপাদান।

২) ব্যাপকতা : মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী, জন্মের পূর্ব মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিশুর উপর ক্রিয়াশীল বা প্রভাববিস্তারকারী সমস্ত উপাদানই তার পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এই বিশ্ব প্রকৃতির যত দূরের বস্তুই হোক্ না কেন যা তাকে উদ্দীপিত করতে সক্ষম, যার প্রভাবে শিশু সাড়া দেয় বা দেওয়ার চেষ্টা করে তা সবই শিশুর পরিবেশে স্থান পায়।

৩) পরিবর্তনশীলতা : পরিবেশ সতত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার হার কখনো কম কখনো-বা বেশি। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তনশীলতার নিয়ন্ত্রক কখনো প্রকৃতি, কখনো মানুষ।

৪) মিথষ্ক্রিয়তা : পরিবেশের উপাদানগুলি যেমন শিশু বা ব্যক্তিজীবনে প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ ক্রিয়াশীল, শিশুও তেমনই পরিবেশকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে। ব্যক্তি এবং পরিবেশের মধ্যে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিই মিথষ্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া নামে পরিচিত।

৫) বিকাশধর্মীতা : শিশু বা ব্যক্তি তার যে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে, তার জন্য প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট কিছু শক্তির। এই শক্তি সে পায় তার পরিবেশ থেকেই। পরিবেশের এই শক্তি শিশুকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে শিশুর দেহ, মন, আবেগ তার সামগ্রিক সত্তা বিকশিত হয়, তার আচরণ ধারায় পরিবর্তন আসে, শিশুর জীবন সুরক্ষিত থাকে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-১ (Check your progress-1)

নির্দেশ : আপনার উত্তর নীচের দেওয়া জায়গায় লিখুন।

এই এককের শেষে দেওয়া উত্তররের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

১. পরিবেশের একটি সংজ্ঞা দিন।

---

২. মিথষ্ক্রিয়া কাকে বলে?

---

৩. পরিবেশের দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

৫.৩.৩ পরিবেশের প্রকার ভেদ (Types of Environment) :

বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশকে ভাগ করেছেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ভৌগোলিক ভূমি-ব্যবহার (land-use) বিশেষজ্ঞ এলিস কোলম্যান (Alice Coleman) ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে ভূ-দৃশ্যকে ভূমি ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিচার করেছেন, সেই ধারণা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠে মোট পাঁচ ধরনের বড় পরিবেশ বা পরিবেশ অঞ্চল দেখা যায়। সেগুলি হল :

১) আদিম পরিবেশ (Wild Environment) : আদিম অরণ্য, উষ্ণ ও শীতল মেরু অঞ্চল, তুন্দ্রা অঞ্চল, আদিম তৃণভূমি, মহাদেশীয় হিমবাহ আবৃত এলাকা, সু-উচ্চ ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, জনহীন উপকূল ভাগ, জনহীন দ্বীপ ইত্যাদি এই পরিবেশ অঞ্চলের অন্তর্গত।

২) গ্রামীণ ও আদিম ভূ-দৃশ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পরিবেশ (Rural fringe environment) : অরণ্যের প্রান্তবর্তী গ্রামীণ অঞ্চল, মরুপ্রান্তবর্তী গ্রাম, মরূদ্যানের বসতি অঞ্চল এই পরিবেশের অন্তর্গত।

৩) গ্রামীণ পরিবেশ (Rural Environment) : অস্থায়ী কৃষিভিত্তিক গ্রাম, নিবিড় জীবিকাশ্রয়ী কৃষি-অঞ্চল, মৎস সংগ্রহকারী ও কণ্ঠ সংগ্রহকারী গ্রাম অঞ্চল, খনিভিত্তিক গ্রাম, ব্যাপক কৃষি-খামার ইত্যাদি এই ধরনের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।

৪) গ্রাম-পৌর উপকণ্ঠের পরিবেশ (Rural fringe environment) : কোনো শহরাঞ্চল এর প্রান্তবর্তী গ্রাম-সংলগ্ন অঞ্চল এই ধরনের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়।

৫) পৌর পরিবেশ (Urban Environment) : কোনো নগরের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল, নগরের ঘনসন্নিবিষ্ট বসবাস অঞ্চল, নগরের শিল্পাঞ্চল এই ধরনের পরিবেশের অন্তর্গত।

পরিবেশের উপাদানগুলির ভিত্তিতে আবার পরিবেশকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ (natural environment)

(২) সাংস্কৃতিক পরিবেশ (cultural environment)

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment) : ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানে মানুষের বাসস্থানের যে প্রাকৃতিক অবস্থা থাকে, সাধারণভাবে তাকেই প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ বললে যে ভূদৃশ্য ফুটে ওঠে তার মধ্যে থাকে মাটি, জল, বাতাস, জলবায়ু, পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল, মরুভূমি এবং সজীব প্রাণ। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের দু'টি প্রধান অংশ হল জড় পরিবেশ আর সজীব পরিবেশ।

(i) জড় পরিবেশ : প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত প্রানহীন যে সমস্ত বস্তুগুলির সমাবেশ সজীব প্রানের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে জীবনীশক্তিকে সঞ্চালিত করে তাকে জড় পরিবেশ বলে। এই জড় পরিবেশ আবার দু'রকমের হয় স্বাভাবিক জড় পরিবেশ আর কৃত্রিম জড় পরিবেশ। স্বাভাবিক জড় পরিবেশ গঠনকারী বস্তুগুলি প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি লাভ করে কিন্তু কৃত্রিম জড় পরিবেশ গঠনকারী বস্তুগুলি মানুষের দ্বারা সৃষ্ট।

(ii) সজীব পরিবেশ : প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত যে সমস্ত বস্তুগুলির মধ্যে সজীব প্রাণের অস্তিত্ব বর্তমান তাদের নিয়ে গড়ে ওঠে সজীব পরিবেশ। সজীব পরিবেশ আবার দুই প্রকার। উদ্ভিজ্ব পরিবেশ এবং প্রাণীজ পরিবেশ। উদ্ভিজ্জ পরিবেশ গড়ে ওঠে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদিকে নিয়ে আর প্রানীজ পরিবেশ গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের নিয়ে।

(২) সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment) : মানুষের সমাগ্রিক জীবনধারার বিভিন্ন অংশকে নিয়ে গড়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ। সাংস্কৃতিক পরিবেশের মূল উপজীব্য বিষয় হল সংস্কৃতি। কিন্তু

সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? এডওয়ার্ড টেলর (Edward Tylor) এর মতে, সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সেই জটিল সামগ্রিক অবস্থা যার মধ্যে সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের অর্জিত সমস্ত জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য সব রকম সার্মথ্য অন্তর্ভুক্ত ("that complex whole which includes knowledge, belief, morals, law, custom and any other-capabilities acquired by man as a member of society")। অধ্যাপক ম্যালিনস্কির মতানুসারে "সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু যেমন— যন্ত্রপাতি, মনস্তত্ব, সামাজিক ও শিল্প প্রকরণ।" আবার বিডনির মতে, সংস্কৃতি হল— কৃষিকার্যের পদ্ধতি ও প্রকরণ শিল্পের উৎপাদন, সামাজিক সংগঠন এবং মানসিক প্রকরণের সমন্বয়।

শিক্ষাবিদ ম্যাকেঞ্জির মতে, "Culture which is generally taken to denote education in its larger sense— the sense in which it is the end of life, rather than the preparation for life. ……it is the deveopment of the spiritual nature of man."

সুতরাং সামগ্রিক আলোচনায় দেখা যায়, সামাজিক বিচারে মানুষের জীবনধারাকে বলা হয় সংস্কৃতি। সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়ের এক মিশ্র ও জটিলরূপই হল সংস্কৃতি। এই সব বিষয়ের মধ্যে পড়ে সমাজ অন্তর্ভুক্ত সমষ্টিগত জ্ঞান, নীতিবোধ, বিশ্বাস, আইনকানুন, প্রথা, লোকাচার, সমাজবদ্ধ মানুষের বিভিন্ন অর্জিত অভ্যাস ও দক্ষতা। সমাজবদ্ধ মানুষের যা কিছু তার সবই হল তার সংস্কৃতির পরিচায়ক।

এই মানবীয় বা সাংস্কৃতিক পরিবেশের আবার দু'টি ভাগ। প্রথমটি হল মানুষের দ্বারা তৈরি বাসস্থান, পথঘাট, রেলপথ, মাঠ, খাল-বিল, জলাশয় ইত্যাদির সমবায়ে গঠিত নির্মিত পরিবেশ (built environment) এবং মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক পরিবেশ (social environment)। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে মানুষের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় ঐ নির্দিষ্ট স্থানে মানুষের সামাজিক পরিবেশ।

উপরে আলোচিত প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানবীয় পরিবেশ বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছাড়াও, বর্তমানে পরিবেশবিদরা পরিবেশের অন্য দুই ধরনের পরিবেশের কথা বলেন, সেগুলিহল— ব্যক্তিনিরপেক্ষ পরিবেশ (objective environment) এবং ব্যক্তিসাপেক্ষ পরিবেশ (subjective environment)।

ব্যক্তিনিরপেক্ষ পরিবেশ : ভূ-পৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠীর সংবেদন, প্রত্যক্ষণ এবং আবেগ নিরপেক্ষভাবে সেই নির্দিষ্ট স্থানের যে রূপ তা হল ব্যক্তি নিরপেক্ষ পরিবেশ।

ব্যক্তিসাপেক্ষ পরিবেশ : ভূ-পৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট স্থানের পরিবেশের ব্যক্তিনিরপেক্ষ রূপ যাই হোক না কেন, যদি সেই স্থানে অথবা অন্য কোনো স্থানের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে বা মনে পরিবেশের রূপ একাধিকভাবে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হয় তবে সেই পরিবেশকে ব্যক্তিসাপক্ষে পরিবেশ বলা হয়। যেমন, কারো দৃষ্টিতে মরু অঞ্চলের নির্জন পরিবেশ বেশ আকর্ষণীয় অথবা ভালো লাগতে পারে, আবার কারো দৃষ্টিতে তা মোটেই আকর্ষণীয় অথবা ভালো নাও লাগতে পারে। কোনো পরিবেশের সঙ্গে কোনো কোনো মানুষের বিশেষ বিশেষ ধরণের আবেগ-বন্ধনী (emotional bonding) থাকতে পারে; যেমন একসময় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ উঠলে মানুষের মনের মধ্যে এক আনন্দ শিহরণ জাগিয়ে ভূ-স্বর্গের ভাবনায় ভাবিত করে তুলত, কিন্তু বর্তমানে তা আর হয় না বরঞ্চ বিপদ সংকুল এক পার্বত্যঅঞ্চলের ভাবনায় ভাবিত করে তোলে। এইভাবে কোনো পরিবেশ কোনো ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে যে রূপ প্রতিভাত হয় তাকেই বলা হয় ব্যক্তিসাপেক্ষ পরিবেশ।

৫.৩.৪ পরিবেশের উপাদান (Components of environment) :

আগেই আলোচনা করা হয়েছে একজন ব্যক্তি তার জীবনকালে তার চতুর্পার্শ্বস্থ যত রকমের উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় তাদের সমন্বয় হল তার জীবন পরিবেশ। পরিবেশের অন্তর্গত এই সমস্ত উদ্দীপক বা অংশগুলিই পরিবেশের উপাদান। পরিবেশের এই সমস্ত উপাদানগুলিকে নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো হল :

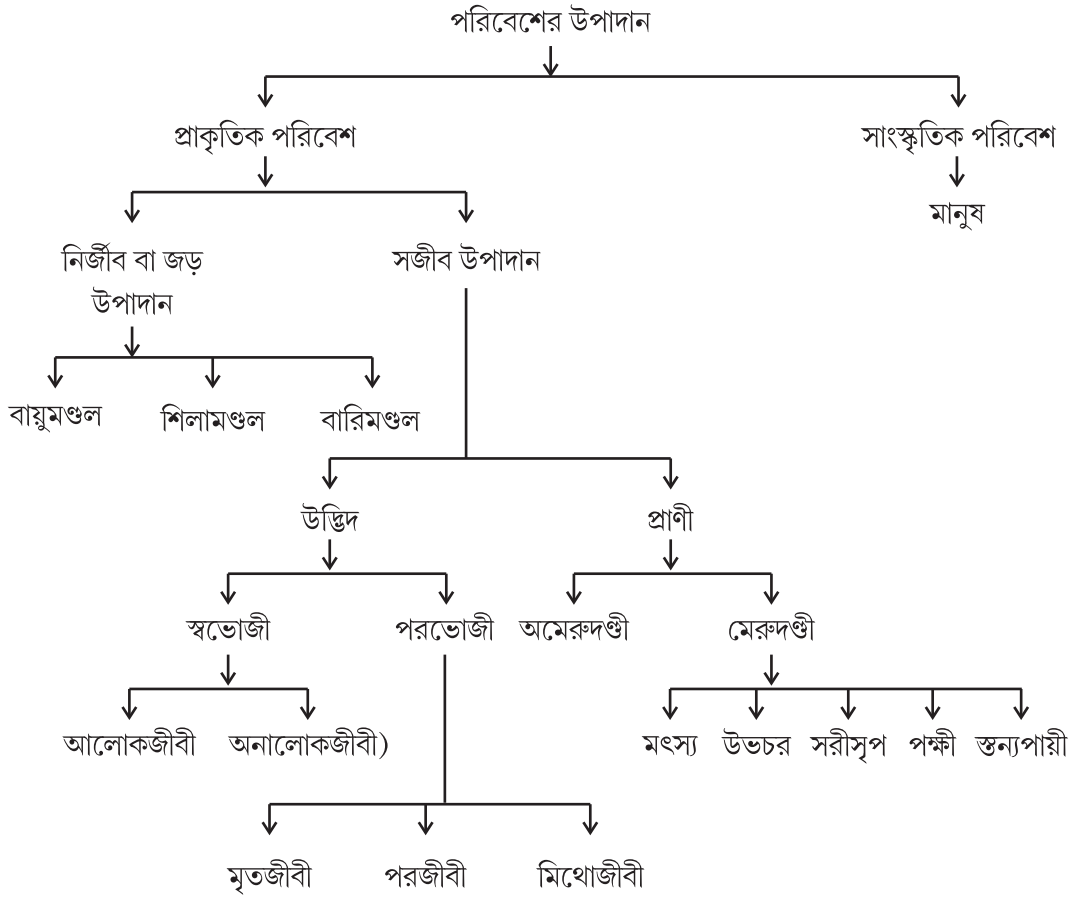

৫.৪ মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্বন্ধ (Relation between man and environment)

'মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্বন্ধ' এর প্রচলিত অর্থ হল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ। মানুষ ও পরিবেশ (প্রাকৃতিক পরিবেশ) এর মধ্যে সম্বন্ধ কীরূপ অর্থাৎ মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেমন তার বিশদ বিবরণ ভূগোল এর একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে

এবং কতখানি মানুষকে বা মানুষের কর্মকে বা কর্মচিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, আবার মানুষই বা তার কর্মচিন্তা বা কর্মের দ্বারা প্রকৃতিকে কীভাবে এবং কতখানি প্রভাবিত করে সে বিষয়ে একটা দায়িত্ব বর্তায় ভূগোল বিজ্ঞানীর অথবা পরিবেশ বিজ্ঞানীর। মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্বন্ধের বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিচে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

মানুষ ও পরিবেশ এর মধ্যে সম্বন্ধের বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব

১) থিওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি

২) জিওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি

৩) উইওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি

৪) বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাবাদ

৫) নব নিয়ন্ত্রণবাদ

নিচে তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

১) থিওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি (Theocratic view) :

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বহু প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে (যেমন ভারতবর্ষ, মিশর, ব্যবিলন, গ্রীস) মানুষের সমাজে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। মনে করা হত এই বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর। মানুষ সমেত বিশ্বপ্রকৃতি এক চিরায়ত প্রাকৃতির ও নৈতিক নিয়মের অধীন। এই চিরায়ত বা শাশ্বত নিয়মই হল ধর্ম, যা মানুষ আর প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে। এই শাশ্বত নিয়মের ভিত্তিতেই সৃষ্ট বিশ্বজগতে মানুষের বেঁচে থাকা এবং মানুষেরই চেতনার উন্নতির জন্য শৃঙ্খলা পরায়ণ প্রকৃতিকে ঈশ্বরের দান হিসাবে গ্রহণ করা, প্রকৃতির সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং প্রয়োজন অনুসারে সেই প্রকৃতিকে ব্যবহার করা। মানুষের চেতনার বিকাশের জন্যই এই বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি, মানুষের সাথে প্রকৃতির এই উদ্দেশ্যমূলক সম্বন্ধের অস্তিত্বে বিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গি বা তত্ত্বকে গ্রিফিথ টেলর (Griffith Taylor) নাম দিয়েছেন থিওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন কার্লরিটার।

২) জিওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি (Geocratic view) :

এই মতবাদ অনুসারে মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধে প্রকৃতিই মুখ্য ও সক্রিয়, মানুষের ভূমিকা গৌণ। প্রকৃতিকে এখানে একটি স্বাধীন সত্তা হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং প্রকৃতিকে চালনা করার ব্যাপারে কোনো অতি মানবিক সত্তা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া হয়নি। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল, ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের জীবন ও কর্মপ্রক্রিয়ায় যে সমস্ত বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়, সেইসব রূপের বিভিন্নতার কারণ হল প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ; বাসস্থান এবং মানুষের জীবিকা ও সামাজিক ব্যবস্থা এক রকমের নয়। এর মূল কারণ হল বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলি বিভিন্ন। এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের জীবনও কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন। পৃথিবীর কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের মানুষের জীবন প্রকৃতি কেমন হবে তা নির্ধারণ করে দেয় সেই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন আলেকজান্ডার ফন হুমবোল্ট। এই মতবাদকে প্রাকৃতিক পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদও বলা হয়।

৩) উইওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি (Weocratic view) :

এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন পেলে ভিদাল দ্য লা ব্লাশ নামে এক ফরাসী ভূগোলবিদ ও লুসিয়াঁ ফ্যভ্র্ নামে এক ফরাসী ঐতিহাসিক। ভিদাল এর মতে, মানুষ আসলে প্রকৃতিরই অংশ, জীবন্ত সৃষ্টি। প্রকৃতি হল মানুষের উপদেষ্টা স্বরূপ। ভিদালের মতে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের

যে ভিন্ন ভিন্ন জীবনের ধারা বা ধাঁচ লক্ষ্য করা যায় তার মূল কারণ প্রকৃতি ও মানুষের মিলিত পারস্পরিক সহযোগিতা। ঐতিহাসিক ফ্যভ্র মতে, প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে বা মানব গোষ্ঠীকে এমন কতকগুলি সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করে যাতে মানুষের কর্মজীবনে কতকগুলি সুযোগ বা সম্ভাবনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অন্যদিকে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টায় কী করবে আর কী করবে না তা নির্ভর করে মানুষের পছন্দ বা অপছন্দেরওপর বা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। মানুষের এই পছন্দ, অপছন্দ নির্ভর করে তার সাংস্কৃতি, কলা-কৌশলগত উন্নতি এবং সমাজের মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এখানে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্বন্ধের ভিত্তি ধরা হয়েছে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে। এজন্য টেলর এই দৃষ্টিভঙ্গিটির নামকরণ করেছেন 'উইওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি' (weocratic view) অর্থাৎ যার মূল কথা 'আমাদের শাসন'। এখানে 'আমাদের' বলতে প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ের মিলিত অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

৪) বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা বাদ (Scientific probabilism) :

ভৌগোলিক O. H. K. Spate প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে সম্বন্ধকে নির্দেশ করলেন রাশিবিজ্ঞানের সম্ভাবনাবাদ-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে। স্পেট-এর মতানুসারে, মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে না ঠিকই কিন্তু তা মানুষের কর্ম প্রচেষ্টাকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, কোনো কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের কোনো কোনো কর্মপ্রচেষ্টার সম্ভাবনা তার অন্যান্য কর্মপ্রচেষ্টার তুলনায় অনেক বেশি থাকে। এই পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ দাঁড়ায় বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাভিত্তির উপর।

৫) নবনিয়ন্ত্রণবাদ (Neo-determinism) :

ভূগোলবিদ গ্রিফিথ টেলর প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলেন। টেলর-এর মতানুসারে, মানুষের কর্ম প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক পরিবেশ চরম নিয়ন্ত্রক না হলেও তার প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। অর্থাৎ মানুষের সাপেক্ষে তার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি বিশাল ক্ষেত্র, যেখানে মানুষ প্রকৃতির ক্ষমতাকে বা প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারে না। কোনো বড় শহরের ট্রাফিক পুলিশের ন্যায় প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কর্ম প্রচেষ্টাকে একটি নিয়মতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। সেখানে মানুষের অবাধ স্বাধীনতার স্থান নেই। টেলরের এই মতবাদটি 'Stop-and-go determinism' নামেও পরিচিত।

প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রকৃতি মানুষকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম বা সক্ষম নয়, বা মানুষের কর্ম প্রচেষ্টাতে কতখানি সুযোগদেয় কি দেয় না, সেদিক থেকে যেমন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধকে বোঝবার চেষ্টা হয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষ প্রকৃতিকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছে, প্রকৃতির ওপর তার প্রভাব কতখানি বিস্তার করতে পেরেছে সেদিক থেকেও মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় করার চেষ্টা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূগোলবিদ ল্যাডিস কে. ডি. ক্রিস্টফ (Ladis K. D. Kristof) তাঁর একটি গবেষণাপত্রে মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধে বিষয়ে তিনটি ধারণার উল্লেখ করেছেন—

ক) প্রকৃতির সাথে মিলন ('fusion with nature')

খ) প্রকৃতিকে শাসন ('rule over nature')

গ) প্রকৃতিকে জয় ('conquest of nature')

ক) প্রকৃতির সাথে মিলন : এই ধারণাটি মূলত একটি আধ্যাত্মিক ধারণা থেকে এসেছে। এই ধারণায় সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের প্রকাশ বলে মেনে নেওয়া হয়। প্রকৃতির সাথে মানুষের বই সম্বন্ধটি

দেখা যায় সেইসব সংস্কৃতিতে যেখানে মানবীয় জগৎ আর প্রাকৃতিক জগৎকে আলাদা করে দেখা হয় না। মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে এক পরিপূরক ধারণাকে স্থান দেওয়া হয়। প্রাচীন চীনা ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই ধরনের সম্বন্ধ দেখা যায়।

খ) প্রকৃতিকে শাসন : এই ধরনের মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ দেখা যায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে। ঐতিহ্য অনুসারী পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিশ্বাস করে ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বিশ্ব প্রকৃতি সুসংগত, উদ্দেশ্যমূলক এবং উঁচু-নিচু স্তরে স্তরায়িত। এখানে জড় প্রকৃতির স্থান মানুষের নীচে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টির কারণ মানুষের সার্বিক বিকাশের উদ্দেশ্যপূরণ।

গ) প্রকৃতিকে জয় : মানুষ ও প্রাকৃতির মধ্যে এই ধরণের সম্বন্ধ বিকাশ লাভ মূলত শিল্প বিপ্লবের পর। জড়বাদী দর্শনও ধনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতি কখনোই সুসংগত '(harmonius)' নয়, বরং মানুষের কাজ হল বিশৃঙ্খল প্রকৃতিকে বশ করে সুশৃঙ্খল করে তোলা। প্রকৃতিকে জয় করা অর্থ হল বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দ্বারা প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষের ব্যবহারযোগ্য করে তোলো।

আজকের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে পৃথিবীর স্থলপৃষ্ঠে বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রায় অবলুপ্ত। বেশীরভাগ স্থানে পরিবেশ বলতে যা দেখতে পাওয়া যায়, তা হল এক ধরণের রূপান্তরিত পরিবেশ, বলা যেতে পারে মানব-পরিবর্তিত পরিবেশ। সুতরাং 'প্রকৃতিকে জয় করা' মানুষের প্রায় শেষ পর্যায়ে। কিন্তু প্রকৃতির এই সাম্রাজ্য জয় করে মানুষের প্রাপ্তি কী? মানুষ যা পেয়েছে তা হল বিষয়গত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মতৃপ্তি, কিন্তু তার পরিবর্তে মানুষকে যে মূল্য দিতে হচ্ছে তার পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ দূষণের ছড়াছড়ি— বায়ুদূষণ, জলদূষণ, মাটিদূষণ, শব্দদূষণ ইত্যাদি। বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ারে বাতাসের গড় উষ্ণতা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে দেখা দিয়েছে বিশ্বউষ্ণায়ণ (global warming), ওজোন স্তরের ভেতরে যে ছোট বড় ছিদ্র সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রশস্ত হয়েছে এই মানবগোষ্ঠীরই মৃত্যু গহ্বরের পথ। মানুষ আজ ভয়ংকর সংকটের মুখোমুখি, মানুষের নিজেরই জীবন আজ সামগ্রিকভাবে বিপন্ন।

এই বিপন্ন মানুষের পরিস্থিতি দেখে বিংশ শতকের সাতের দশক থেকে উদ্বিগ্ন কিছু বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সার্বিকভাবে চিন্তা শুরু করেছেন। পৃথিবীর এই সংকটময় পরিস্থিতিতে পরিবেশ সম্পর্কে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা থেকে জন্ম নিয়েছে পরিবেশবাদ (environmentalism)।

পরিবেশবাদ বলতে কী বোঝায়? মানবগোষ্ঠীর কাজের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে, এই বিষয়ে যে সচেতনতা তাকেই নির্দেশ করে পরিবেশ বাদ। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'পরিবেশবাদ এবং সাংস্কৃতিক তত্ত্ব' বা (Environmentalism and Cultural Theory) নামক গ্রন্থে কে. মিলটন (K. Milton) লিখেছেন এনভাইরনমেন্টাল জয়, "refers to a concern that the environment should be protected, particularly from the harmful effects of human activities."

পরিবেশবাদীদের বিভিন্ন মতবাদে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁরা একমত হয়, প্রাকৃতিক পরিবেশকে হয় কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। পরিবেশের সংকটময় পরিস্থিতি থেকে মানুষের রক্ষার উপায় হল পরিবেশ-বান্ধব (eco-friendly) দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালী অনুসরণ করা। তাহলেই এই পৃথিবী হবে শিশুর বাসযোগ্য ভূমি।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-২ (Check your progress-2)

নির্দেশ : . . . . . একই বিষয় হবে।

ক) পরিবেশের কত প্রকার?

খ) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলির নাম লিখুন।

গ) নবনিয়ন্ত্রণবাদ কি খুব সংক্ষেপে লিখুন।

৫.৫ পরিবেশগত অনুভূতি বা পরিবেশগত বেদন (Environmental perception)

পরিবেশগত অনুভূতি বা পরিবেশগত বেদনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'environmental perception'; environmental কথাটির অর্থ হল পরিবেশগত এবং ইংরেজি perception কথাটির মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থ হল প্রত্যক্ষণ। Perception শব্দটি ইংরেজি feeling এর প্রায় সমার্থক, সেই অর্থে perception শব্দটিকে বলা যেতে পারে 'অনুভূতি' বা 'বেদনা'। 'বেদনা' বলতে বোঝায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা থেকে উদ্ভূত সংবেদন থেকে উৎপন্ন সুখ-দুঃখের অনুভূতি। সুতরাং 'environmental perception' বা 'পরিবেশগত বেদন' শুধুমাত্র পরিবেশ প্রত্যক্ষণই নয়, বরং তার মধ্যে থাকে বিশেষ 'অনুভূতি' বা বেদনা।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে পরিবেশ শুধু ব্যক্তি নিরপেক্ষ বা বিষয়গত (objective) নয়, তা ব্যক্তিসাপেক্ষ বা বিষয়ীগত (subjective) ও বটে। কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ইন্দ্রিয় সংবেদন তথা প্রত্যক্ষণের ভিতর দিয়ে যেভাবে অনুভূত হয়, তা-ই হল বিষয়ীগত পরিবেশ। কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি পরিবেশটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে অথবা নিজের নিজের অনুভূতিতে গ্রহণ করতে পারে। পরিবেশে প্রকাশ পরিবেশগত বেদনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কোনো ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠী কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করেন তাই হল সেই ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠীর পরিবেশগত বেদন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রূপ, সিদ্ধান্ত ও কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে তার পরিবেশগত বেদন।

পরিবেশগত বেদনকে নিম্নলিখিত পাঁচটি পর্যায়ে বিচার করা হয় :

১) আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া (emotional response)

২) অভিমুখজনিত প্রতিক্রিয়া (orientative response)

৩) শ্রেণি বিভাজনকারী প্রতিক্রিয়া (classifying response)

৪) সংগঠনকারী প্রতিক্রিয়া (organizing response)

৫) চালনাকারী প্রতিক্রিয়া (manipulative response)

পর্যায়গুলি খুব সংক্ষেপে নিচে ব্যাখ্যা করা হল :

কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশ প্রথম পর্যায়ে মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর সামনে বিভিন্নধরনের উদ্দীপককে উপস্থিত করে। বিভিন্ন উদ্দীপকের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ আবেগ দেখা যায়। মানুষের এই আবেগ প্রধানত তিনটি— ভয়, ক্রোধ আর ভালোবাসা। ভয়ের মূলে যেমন থাকে পলায়ন প্রতিক্রিয়া (flight response), ক্রোধের মূলে তেমনই যোধন প্রতিক্রিয়া (fight response)। ভয়, ক্রোধ ও ভালোবাসা এই তিনটি দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ অভিমুখ নির্ধারণ করে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে মানুষ তার প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন উদ্দীপককে শ্রেণি বিভাগ করে চতুর্থ পর্যায়ে শ্রেণিবদ্ধ বিভিন্ন উদ্দীপককে সংগঠিত করে বা বিন্যাস্ত করে। সংগঠিত উদ্দীপক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে পঞ্চম পর্যায়ে মানুষ তার সামগ্রিক প্রতক্রিয়াকে চালিত করে। পরিবেশগত বেদনই মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব (attitude) ও আচরণকে (behaviour) নির্ধারিত করে। এরফলেই পরিবেশের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন রকমের হয়, যেমন সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি, সমবেদনার দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি, ভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি, বিরক্তি বা ক্ষোভের দৃষ্টিভঙ্গি, ভালো লাগার দৃষ্টিভঙ্গি। আবার কখনো কখনো এই দৃষ্টিভঙ্গির হতে পারে উদ্দেশ্যমূলক, শোষণমূলক, সাবধানমূলক কিংবা বন্ধুত্বপূর্ণ। পরিবেশের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব যেমন মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর আচরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় পরিবেশ।

৫.৬ শিশুর পরিবেশ (Environment of child)

ফয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের সুবাদে আজ এ কথা প্রতিষ্ঠিত এবং বহুজন স্বীকৃত যে মানবজীবনের গুরুত্ব সময় হল শৈশবকাল। শৈশবের অভিজ্ঞতারাজিই মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ভিত্তিভূমি রচনা করে। বস্তুত, অভিভাবক-অভিভাববিকারাই শুধুমাত্র নয় আজকের বুদ্ধিজীবী সমাজ জীববিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিজ্ঞানী ও শিক্ষক সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে এই শিশু। তাই 'শিশু' আজ 'বহু বিষয়কেন্দ্রিক' (multi-disciplinary) ধারণা এবং গবেষণার বিষয়বস্তু (subject matter of research)। যে পরিবেশে শিশুর নিরাপত্তা ও যত্ন নিশ্চিত হয়, সেই শিশু বান্ধব পরিবেশ (child-friendly environment) নিয়ে সবার আগ্রহ ও চিন্তা। শৈশবকালীন যত্ন, তার শিক্ষা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ রচনার মাধ্যমে শিশু-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা কিভাবে সম্ভব তা-ই নিয়ে সকলেই চিন্তিত। কিন্তু এই 'শিশু' আসলে কী এবং 'শিশুর পরিবেশ' বলতেই বা কী বোঝায় সেই বিষয়ে আমরা একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো।

৫.৬.১ শিশুর ধারণা (Concept of child) :

'শিশু' কী? তা জানার জন্য কোনো একক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যাবে না। জীববিজ্ঞানীর কাছে, শিশু যে ভাবে ব্যাখ্যাত হয়, সমাজবিজ্ঞানীর কাছে ঠিক সেইভাবে নয়, একটু ভিন্নভাবে, কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশু যে ভাবে প্রতিভাত হয়, শিক্ষকের কাছে ঠিক তেমনভাবে প্রতিভাত হয় না। সুতরাং 'শিশু'কে জানতে হলে তার যে সমস্ত 'সত্তা' পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতেই তাকে দেখতে হবে। পিতা-মাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা তাকে যেভাবে দেখতে চান, জানতে চান তা হল তার একক ও যৌথ সত্তার বিষয়কে কেন্দ্র করে। সেদিক থেকে শিশুর একক সত্তা বলতে বোঝায় তার 'জৈবিক সত্তা' অর্থাৎ জৈবিক ধারণায় শিশু (biological concept of child) এবং 'যৌথ সত্তা' বা 'সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্তা' অর্থাৎ 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারণায় শিশু'। নিচে এই ধারণা দুটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হল :

জৈবিক ধারণায় শিশু (Biological concept of child) :

বিশাল ও বৈচিত্র্যময় এই জীবজগতে প্রতিটি জীব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে, এই সময়কালকে বলা হয় জীবের জীবনকাল। জীবের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টি হল তার জীবনকাল। কিন্তু জীব শুধু মাত্র তার জীবনকালেই সীমাবদ্ধ নয়, সে বেঁচে থাকে তার নির্দিষ্ট প্রজাতিকে রক্ষাড় করার মাধ্যমে। জীবের প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা হয় জীবের জনন প্রক্রিয়ার দ্বারা নতুন বংশধর সৃষ্টি মাধ্যমে। অবশ্য বংশধরদের মধ্যে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়। এই কারণেই বাঘের সন্তান বাঘ, হরিণের সন্তান হরিণ, খরগোসের সন্তান খরগোষ এবং মানুষের সন্তান মানুষই হয়। কাজেই পিতা-মাতার সবরকম বৈশিষ্ট্যই (দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি) সন্তান-সন্ততির মধ্যে বর্তায় বা সঞ্চারিত হয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সঞ্চরণ ঘটে তাকে বলা হয় বংশগতি (heredity)। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই অনেক মানুষকে বলতে শোনা যায় যে তিনি তাঁর শুভ্রকান্তি বা গৌরকান্তি অথবা আয়তনয়ন পেয়েছেন তাঁর মাতা বা পিতার কাছ থেকে। সত্যি কথা বলতে কি, এই ধরণের বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ পিতার জননকোষ বা শুক্রানু (sperm) এবং মাতার জননকোষ বা ডিম্বানু (ovum) পরস্পর মিলিত হয়ে (নিষেক) যে জাইগোট বা ভ্রূণানুর সৃষ্টি হয় তার থেকেই জন্মলাভ করে মানবশিশু। সন্তানের বৈশিষ্ট্যগুলি এই জননকোষ অর্থাৎ শুক্রানু বা ডিম্বানুর কোনটির মধ্যেই থাকে না, যা থাকে তা হল গৌরকান্তি বা আয়তনয়ন গঠনকারী জীনগুলি, তার সঙ্গে আরো কিছু নিয়ন্ত্রক। ঐ জীন ও নিয়ন্ত্রকগুলির কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীকালে বিশেষ বিশেষ শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ ঘটে। আবার জননকোষ বা germ cell-এর মধ্যে যে প্রোটোপ্লাজম অবস্থান করে তাকে বলা হয় 'জার্মপ্লাজম'। এই জার্মপ্লাজমের মধ্যেই অবস্থান করে জীনগুলি।

সুতরাং আমরা বলতে পারি পিতা-মাতা থেকে সন্তান সন্ততির মধ্যে জার্মপ্লাজমের সঞ্চরণ হল বংশগতি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার যে প্রতিটি শারীরিক, মানসিক ও অমান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মূলে এক একটি জীন থাকে না। প্রতিটি বৈশিষ্ট্য অসংখ্য জীন-এর সম্মিলিত ক্রিয়ার ফল।

নিষেক ক্রিয়ার পর সৃষ্ট জাইগোট এরপর ক্রমান্বয়ে মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে বিভক্ত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গঠিত হয় বহুকোষী অথবা প্রাপ্ত একটি পূর্ণাবয়ব মানব ভ্রূণ। বিকাশের এই পর্যায়ে মানবভ্রূণ অবস্থান করে তার মাতৃ জঠরে অর্থাৎ মাতৃ জরায়ুতে। মাতৃ জরায়ুতে যখন একটি ডিম্বাণু একটি শুক্রানুকে নিষিক্ত করে তখন তৈরি হয় একটি মাত্র ভ্রূণ, যখন একই সঙ্গে জরায়ুর দুই

পার্শ্বে অবস্থানকারী দুটি ডিম্বানুকে পৃথক পৃথকভাবে নিষিক্ত করে দুটি পৃথক পৃথক শুক্রানু তখন তৈরি হয় দু'টি পৃথক ভ্রূণ যারা 'যজম' নামে পরিচিত হয়, কিন্তু অসমকোশী বা অসদৃশ যমজ (non-identical twins)। আবার যখন একটি সদ্য গঠিত জাইগোট কোষ বিভাজন পর্যায়ে হঠাৎ দু'টি পৃথক অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পৃথক ভাবে দু'টি ভ্রূণ উৎপন্ন করে তখন তারা যে যে দুটি মানবশিশুতে পরিণত হয় তাদের বলা হয় সমকোষী বা সদৃশ যমজ (identical twins)।

এই পূর্ণাবয়ব মানব ভ্রূণ যখন ভূমিষ্ঠ হয় অর্থাৎ মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃথক ও স্বাধীনভাবে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় তখন তাকেই বলা হয় সদ্যজাত মানবশিশু। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত হয় তার সামগ্রিক দৈহিক সত্তা। যেমন— পেশীকঙ্কাল তন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, সংবহন তন্ত্র, রেচন তন্ত্র, প্রজননতন্ত্র এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমেত স্নায়ুতন্ত্র। সেইসব তন্ত্রগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালে গঠিত হয় হরমোন তন্ত্র। এই সমস্ত তন্ত্রগুলির অন্তর্গত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি থাকে অবিকশিত বা বিকাশমান পর্যায়ের কোন একটি দশায়। পরিণতি লাভের পর মানবশিশু (ছেলে বা মেয়ে) টিকে আমরা পাই একজন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত বয়স্কের পুরুষ বা নারী হিসাবে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারণায় 'শিশু' (Sociological and cultural concept of child) :

শারীরতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে যেমন দেখা যাবে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে পরস্পর সম্পর্কিত, তেমনি একটি সমন্বিত বিন্যাসে সক্রিয়ও। অর্থাৎ মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্রে সু-সমন্বিতভাবে একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা (system) তৈরি করে দিয়েছে। গিওর্গ সিমেল অনুরূপভাবে বলেছেন যে, ব্যক্তি-মানুষ পরস্পর পরস্পরের ওপর যে সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলে তাকেই বলা হয় সমাজ। এই মর্মে তিনি মন্তব্য করেছেন যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন স্বার্থ চরিতার্থ বা উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলেও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির আচরণে একটা সমতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সিমেলের মতে, বিভিন্নতা সত্ত্বেও কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতি বা কর্মপন্থার ভিত্তিতে মানুষের গোষ্ঠীগত জীবন অক্ষুণ্ণ রাখার মিথষ্ক্রিয়াই হল সমাজ-ব্যবস্থা (social system)।

বাবা-মা'র পারিবারিক সীদ্ধান্তের অংশীদার হয়ে যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়, তার জন্ম পরিবারেই। সমাজেই মানুষের জন্ম, সমাজের মধ্যেই তার বৃদ্ধি ও বিকাশ, সমাজেই তার জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিতৃপ্তি, সমাজেই তার জীবনের পরিসমাপ্তি। সামাজিক কল্যাণ ও সংহতির মধ্যেই ব্যক্তিকল্যান ও তার অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব। ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম, শিক্ষা, নীতিবোধ সবাই সমাজ জীবনের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর দু'টি বিরোধী ধারণা নয়, বরং তারা একে অন্যের পরিপূরক। স্বনামধন্য বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পালের কথায় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এইভাবে "ব্যক্তি ও সমাজ দুই এর একটাকেও অগ্রাহ্য করতে পারি না, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন একটা মত আছে, যেমন একটা বিচার আছে, বিবেক আছে, তেমনি সমষ্টিগতভাবে যে সমাজ তারও একটা মত আছে, বুদ্ধি আছে, বিচার আছে, বিবেক আছে। Individual conscience যেমন একটা আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে social conscience বলেও একটা জিনিস আছে। Individual স্বাধীনতার যেমন একটা অধিকার আছে তেমনি সমষ্টিগত সমাজ শাসনের একটা অধিকার আছে। এটা যদি অস্বীকার করি তাহলে একদিকে যেমন ব্যক্তির উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়, তেমনি অন্যদিকে সমাজশৃঙ্খলা নষ্ট হয়, আর শৃঙ্খলা যদি না থাকে তাহলে ব্যক্তির সার্থকতা লাভ সম্ভব হয় না।"

সমাজ বিজ্ঞানীগণ এই মত পোষণ করেন যে, সমাজের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আত্মিক সম্পর্ক

তাদের পারস্পরিক সক্রিয়তার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই সক্রিয়তার জন্যই কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাজ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এর ফলে তার অগ্রগতির ধারাও রক্ষিত হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি পর্যায়ক্রমে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের দ্বারা সামাজিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়, তাই হল সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সংঘটিত সামাজিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে, তাদের চরিত্র বিচার করে ভিন্ন ভিন্ন নাম করণ করেছেন। এই রকমই কিছু মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়া হল— মিথষ্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction process), সামাজিকীকরণ (socialization), বিরোধিতা ও সহযোগিতার প্রক্রিয়া (Process of opposition and cooperation), সহাবস্থান (Accommodation), আত্তীকরণ (Assimilation) ইত্যাদি।

সুতরাং উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, মানবশিশু যেমন একদিকে একটি জৈবিক সত্তা নিয়ে জন্মায়, তেমনি অপরদিকে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সামাজিক সত্তা ও বর্তমান।

আমরা দেখলাম মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, একাকী কোন মানুষই দেখা যায় না। যে কোন একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবেই সে জীবনযাপন করে, সেটাই তার পরিচিতি। মানুষের দৈনন্দিক জীবনধারায় যে সব কর্মপদ্ধতি দেখা যায় তা কতকগুলি সামাজিক বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত। মনুষ্যের প্রাণীদের মধ্যেও এই সামাজিক জীবনধারা লক্ষ্য করা যায়। বানর ও বনমানুষ দলবদ্ধ এবং গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাসের প্রবণতা দেখায়। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে এদের মধ্যেও দেখা যায়। নিম্নস্তরের কিছু প্রাণী ও পতঙ্গের মধ্যেও সামাজিক ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। বেঁচে থাকার জন্য এরা বিভিন্ন কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা করে থাকে, নিজেদের আশ্রয়ের জন্য যে বাসস্থান বা আশ্রয়স্থল রচনা করে তার মধ্যেও থাকে কারিগরি কুশলতা, শিল্পের নিদর্শন। মৌমাছি, পিঁপড়ে, উইপোকা এরা প্রত্যেকেই একটি করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় আপন আপন বাসস্থান রচনা করে। মানুষের সামাজিক জীবনধারার সাথে এদের সমাজিক জীবনধারাও বেশ কিছু মিল আছে। কিন্তু এই দুই সমাজধারার মধ্যে মূলগত প্রভেদ আছে অবশ্যই। মনুষ্যতর জীবদের জীবনধারায় যে কর্মপদ্ধতি তার মধ্যে পরিবর্তনের কোন চিহ্ন বা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, গতানুগতিকভাবে একই সমাজধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না। মানুষ তার আপন সামাজিক জীবনধারায় এনেছে কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন, পরিবেশের উপাদানকে সে কাজে লাগিয়েছে আপন চিন্তা চেতনায়। বিবর্তনের হাত ধরে মানুষ যে জায়গায় আজ এসেছে তাতে আছে তার নিজস্ব মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন। পরিবর্তনের ধারায় এনেছে গতিশীলতা। এই পরিবর্তন বা রূপান্তরই হল মানবসমাজের মূলগত লক্ষণ। এই পরিবর্তনের হাত ধরেই মানুষের জীবনে যে চিন্তা-চেতনার প্রকাশ, তার মধ্যেই আছে সংস্কৃতিক মূল সূত্র। পরিবর্তনের প্রবণতাই মানুষের জীবনে সংস্কৃতির সূচনা করে। মনুষ্যেতর প্রাণীদের সামাজিক জীবনধারায় এই সংস্কৃতির নিদর্শন ও প্রবাহ নেই। বাবুইপাখির বাসা নির্মাণ, মৌমাছির মৌচাক নির্মাণ,মাকড়সার জাল তৈরি প্রতিটির মধ্যে শিল্পনিদর্শন ও প্রযুক্তির ছোঁয়া থাকলেও সেগুলির মধ্যে পরিবর্তনের কোন প্রবণতাই নেই। এগুলি নির্মিত হয় ঐ সমস্ত প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) দ্বারা, পারস্পরিক শিক্ষাদানের ভিত্তিতে নয়। একমাত্র মানুষের সামাজিক জীবনধারায় কর্মপদ্ধতি অনুসন্ধান করলে পরিবর্তনের ধারা ও প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে। এই কারণেই মানুষের সংগঠিত কর্মপদ্ধতিতে সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। তাই একমাত্র মানুষই পৃথিবীতে সাংস্কৃতিক জীব, তার একটি সাংস্কৃতিক সত্তা আছে।

সুতরাং সামাগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে মানুষের যেমন

একটি জৈবিক সত্তা আছে, তেমনি তার আছে সামাজিক সত্তা এবং সর্বোপরি তার সাংস্কৃতিক সত্তা। মানবশিশুকে দেখতে হবে এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, তার বিকাশের ধারাও হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে।

৫.৬.২ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and development of child) :

বৃদ্ধি ও বিকাশ জীবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। জীবজগতে এই দু'টি স্বাভাবিক ঘটনা। মানবজীবনও এই দু'টি স্বাভাবিক ঘটনার মাধ্য পরিণতি হয়ে ওঠার দিকে অগ্রসর হয়। ভ্রূণানু গঠনের শুরু থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারাটি বজায় থাকে। এই বৃদ্ধি বিকাশ বলতে কী বোঝায়? শিশুর জীবনে বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারাটির গুরুত্ব কী? বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারায় শিশুর বংশগতি ও পরিবেশের ভূমিকা কতখানি সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে এই অধ্যায়।

মানবজীবনে বৃদ্ধি ও বিকাশ দু'টি বিষয় গতিশীল পরিবর্তনের দু'টি ভিন্ন পরিস্থিতিতে নির্দেশ করে, এদের একটি হল পরিমাণ (Quantity) এবং অন্যটি হল গুণমান (Quality)। জীবন সঞ্চারের মুহূর্ত থেকে অর্থাৎ জাইগোট বা ভ্রূণানু গঠনের পর থেকে মানব শিশুর মধ্যে সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

জন্ম পূর্ববর্তী বৃদ্ধি

মাতৃজরায়ু প্রাচীরে জাইগোট (ব্লাস্টোসিস্ট) রোপিত হওয়ার 2 থেকে 3 সপ্তাহ পরেই মানবভ্রূণের আকৃতি আণুবিক্ষনিক স্তরেই থেকে গেলেও প্লাসেন্টা ও ভ্রূণ থলির বৃদ্ধি প্রথমদিকে খুব দ্রুত হয়। ভ্রূণের বৃদ্ধি এরপর বয়সের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখা গেছে 12 সপ্তাহ পর এই দৈর্ঘ্য প্রায় 10 সেমি, 20 সপ্তাহে 25 সেমি এবং 40 সপ্তাহ পর প্রসবের সময় প্রায় 53 সেমি হয়। দৈর্ঘ্যের ঘনফলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণদেহের ওজনবৃদ্ধিও ঘটে সমানুপাতিক হারে। প্রথম সাড়ে পাঁচ মাসে ভ্রূণদেহের ওজন হয় 450 গ্রামের মত, গর্ভের শেষ তিন মাসে ভ্রূণদেহের ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং গর্ভকালীন শেষ পর্যায়ে ভ্রূণের ওজন গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় 3 কিলোগ্রামে। আবার অন্যদিকে গর্ভসঞ্চারের 4 সপ্তাহ পরে মাতৃগর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হতে শুরু করলেও শ্বাসক্রিয়া শুরু হয় না। গর্ভস্থ ভ্রূণের মাঝামাঝি পর্যায়ে ভ্রূণ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বা ভ্রূণথলিরস গ্রহণ শোষণ করতে পারে।

এইভাবে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের কোষ বিভাজ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কলা, অঙ্গ, অঙ্গতন্ত্রের গঠন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এরপর পূর্ণাবয়ব মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এই গঠন প্রক্রিয়া ক্রমশ চলতে থাকে। এইভাবে মানবজীবনের যেকোনো মুহূর্তে মানুষের নিজস্ব জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলির এই পরিবর্তন তাকে পূর্বমুহূর্তের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে পৌঁছে দেয়। একেই জৈবিক দিক থেকে বলা হয় বৃদ্ধি। জীববিজ্ঞানীদের কথায় "Growth refers to the process of quantitative changes in various characteristics of the individual with reference to a frame of time." প্রচলিত জীব বিজ্ঞানের ধারণায় প্রাণীর এই আকার ও আয়তনগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হত বৃদ্ধি। কিন্তু আধুনিকালে জীববিজ্ঞানীগণ বৃদ্ধিকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে রাজী নন। জীববিজ্ঞানীগণ বর্তমানে প্রাণীর বৃদ্ধির সাথে সাথে অঙ্গের বা অঙ্গতন্ত্রের যে আকার ও আয়তনগত পরিবর্তন ঘটে তা প্রাণীটিকে পরিবেশের সাথে কতখানি মানিয়ে নিতে সাহায্য করছে অর্থাৎ তার ক্রিয়াশীলতাকে গুরুত্ব দিতে চান। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি তার গুণগত দিকটিকে কতখানি অগ্রসর ঘটাতে সক্ষম সেটিই প্রধান বিবেচ্য। বৃদ্ধির এই গুণগত দিকটিই হল বিকাশ বা বিকাশ প্রক্রিয়া (Developmental process)।

জীববিজ্ঞানের ভাষায় "Development is the continuous progressive qualitative change in the life of the child." অর্থাৎ ক্রমউন্নয়ণধর্মী সামগ্রিক গুণগত পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া শিশুর জীবনধারায় সতত ঘটমান, তাই হল বিকাশ। সুতরাং বিকাশ এক ধরনের জৈবনিক প্রক্রিয়াই শুধু নয়, একটি সার্বিক প্রক্রিয়া। এই বিকাশ প্রক্রিয়ার বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হল :

(i) বিকাশ হল সমগ্র জীবনব্যাপী ঘটমান প্রক্রিয়া অর্থাৎ ব্যক্তির জন্ম মুহূর্ত থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকে।

(ii) বিকাশ হল ব্যক্তিজীবনের ক্রমসমষ্টিমূলক প্রক্রিয়া। বিকাশের প্রতিটি পরবর্তী স্তর তার পূর্ববর্তী স্তরের সাথে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল।

(iii) ব্যক্তিজীবনে বিকাশের অভিমুখ সকল সময়ে সামগ্রিক অবস্থা থেকে বিশেষ অবস্থার দিকে অগ্রসরমান।

(iv) মানবজীবনের সকলের ক্ষেত্রেই বিকাশের ধারা প্রায় একইরকম অর্থাৎ সমরূপতা প্রদানি করে (ব্যক্তিগত বৈষম্যকে বাদ দিলে)।

(v) বিকাশ ব্যক্তিজীবনের নির্দিষ্ট স্তর অনুযায়ী ঘটে থাকে এবং প্রতিটি স্তরের বিকাশ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

(vi) মানবজীবনে বিকারগত বৈশিষ্ট্যগুলি একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশ সামগ্রিকভাবে সমন্বয়ধর্মী।

আধুনিক যুগে শিক্ষাকে মানুষের সমগ্র জীবনকাল ব্যাপী এক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মত বিকাশ প্রক্রিয়াও ব্যক্তিজীবনে ঘটমান প্রক্রিয়া। মানবজীবনে শিক্ষা ও বিকাশ প্রায় সমধর্মী এক প্রক্রিয়া, তাই বিকাশের মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুসরণ করে পিতা-মাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুর জীবনবিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে বিকাশ প্রক্রিয়া শিশুর জীবনে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

৫.৬.৩ শিশুর জীবনবিকাশের স্তর (Developmental stage of child's life) :

জীববিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত অমরাবিন্যাস সমন্বিত (Placental) প্রাণীদের মধ্যে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দু'টি অবস্থা দেখা যায়— জন্মপূর্ববর্তী (Pre-natal) এবং জন্মপরবর্তী (Post-natal) অবস্থা। মানুষের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য, অবশ্য মানুষের ক্ষেত্রে এই দু'টি অবস্থার স্থায়িত্বকাল অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক।

মনোবিজ্ঞানীরা মানবশিশুর জীবনবিকাশের স্তরকে বিভিন্ন দিক থেকে ভাগ করেছেন। মনোবিদ পিকুনাস (Pikunas) মানব জীবনের বিকাশের ধারাকে দশটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল (১) প্রাক-জন্মস্তর, (২) সদ্যজাত স্তর, (৩) প্রথম শৈশব স্তর, (৪) শৈশবের শেষ স্তর, (৫) প্রাথমিক বাল্যস্তর, (৬) মাধ্যমিক বাল্য স্তর, (৭) প্রান্তীয় বাল্যস্তর, (৮) যৌবনাগমের স্তর, (৯) প্রাপ্ত বয়স্ক স্তর, (১০) বার্ধক্য স্তর।

বয়সের দিক থেকে এই পর্যায়গুলিকে বিভক্ত করলে নিম্নরূপ বিভাগ পাওয়া যায়—

১) প্রাক-জন্মস্তর — প্রথম গর্ভসঞ্চারের পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত।
২) সদ্যজাত স্তর — জন্মের (ভূমিষ্ঠ) পর থেকে প্রথম চার সপ্তাহ পর্যন্ত।
৩) প্রথম শৈশব স্তর — একমাস থেকে দেড় বছর বয়স পর্যন্ত।
৪) শৈশবের শেষ স্তর — দেড় বছর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত।

৫) প্রাথমিক বাল্য স্তর — আড়াই বছর থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত।
৬) মাধ্যমিক বাল্য স্তর — পাঁচ বছর থেকে নয় বছর বয়স পর্যন্ত।
৭) প্রান্তীয় বাল্য স্তর — নয় বছর থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত।
৮) যৌবনাগমের স্তর — বারো থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত।
৯) প্রাপ্ত বয়স্ত স্তর — একুশ থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত।
১০) বাধক্য স্তর — সত্তর বছরের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

মনোবিদ আর্নেস্ট জোনস্ (Earnest Jones) মানবশিশুর জীবনবিকাশের স্তরকে নিম্নরূপে ভাগ করেছেন :

১) শৈশব স্তর — এক থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত।
২) বাল্য স্তর — পাঁচ থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত।
৩) কৈশোর — বারো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত। এবং
৪) প্রাপ্তবয়স্ক — আঠারো থেকে জীবনের পরবর্তী বয়সকাল।

আর্নেস্ট জোনস-এর এই শ্রেণিবিভাগ মূলতঃ শিশুর জন্ম পরবর্তী বৃদ্ধিকে সূচিত করে। জন্ম পরবর্তী এই দশা বা ভাগগুলিকে আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

জন্ম পরবর্তী বৃদ্ধি (Post-natal Growth) :

1) **শৈশব অবস্থা (Infancy) :** জন্মলাভের পর থেকে শিশুর বৃদ্ধির গতি স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু নিজের অস্তিত্বের কারণে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে সদ্যজাত শিশু তার শ্বাসকার্য চালাতে শুরু করে দেয়। একমাসের পরই শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির হার আবার বৃদ্ধি পায়। শৈশবের শুরুতে শিশুর মাথা এবং ধড় অপেক্ষাকৃত বড় হয়। ধীরে ধীরে মাথাটি সোজা হয়ে ওঠে এবং শৈশবের বৃদ্ধিও ত্বরান্বিত হতে থাকে। শৈশবের পরের দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃদ্ধিরগতি কিছুটা কমে আসে।

2) **বাল্য অবস্থা (Childhood) :** বাল্যাবস্থায়ও শিশুর বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমে আসে। অবশ্য একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃদ্ধির প্রবণতা প্রায় সমরূপই থাকে। বাল্যাবস্থায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দুই দাঁতের উদ্‌গমন ঘটে থাকে। বাল্যাবস্থার শেষের দিকে স্থায়ী দাঁত উদ্গামের সূচনা হয়। এই সময় সামগ্রিক দৈহিক উচ্চতা অপেক্ষা প্রস্থেই বৃদ্ধি ঘটে বেশি। বাল্যের শেষের দিকে মাথার বৃহৎ আকার অনেকটা কমে যায় এবং দেহের রেখিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। বাল্যাবস্থার অন্তিম পর্যায়টি প্রাক্ যৌবনের সময় থেকে যৌবন আগমনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

3) **কৈশোর অবস্থা (Adolescent) :** বাল্য এবং প্রাপ্ত বয়স্ক এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী পর্যায় হল কৈশোর বা বয়ঃসন্ধি। দেহের অভ্যন্তরভাগে বিভিন্ন ধরনের হরমোন গ্রন্থির ক্ষরণের দ্বারা এই সময়কালটি প্রভাবিত। দেহের সামগ্রিক আয়তন ও গঠনে আসে পরিবর্তন। ছেলেদের তুলনায় এই পরিবর্তন মেয়েদের জীবনে আগে আসে। সামগ্রিক গুণগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু ছেলে অথবা মেয়েতে পরিণত হয়, যা ভবিষ্যৎ পুরুষ ও নারীতে রূপান্তরকে সূচিত করে, দেখা যায় যৌন দ্বি-রূপতা (Sexual diamorphism)।

4) প্রাপ্ত বয়স্ক (Adulthood) : কৈশোরের পারে আসে পূর্ণপ্রাপ্তির সময়। দৈহিক উচ্চতা সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধির বিরতি প্রাপ্ত বয়স্কের বিশেষ লক্ষণ। সাধারণত পুরুষরা 21 বছর বয়সে এবং নারীরা 18 বছর বয়সে সম্পূর্ণ উচ্চতা লাভ করে। তবে প্রাপ্ত বয়স্কের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য প্রজনন ক্ষমতার বিকাশের জন্য পুরুষ ও নারীকে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়।

৫.৬.৪ শিশুর জীবনবিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের ভূমিকা :

শিশুর জৈবিক সত্তা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, শিশু বাবার বৈশিষ্ট্য গঠনকারী জিনগুলি লাভ করে শুক্রাণুর মাধ্যমে এবং মায়ের বৈশিষ্ট্য গঠনকারী জিনগুলি লাভ করে মায়ের ডিম্বাণুর মাধ্যমে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকে বিশেষ বিশেষ ধরণের জিনোটাইপ (Genotype) এই জিনোটাইপ অনুসারে শিশুর বিকাশ ঘটে থাকে। বংশগতির ধারায় মানবশিশু যে বিশেষ বিশেষ জিনোটাইপ লাভ করে সেই অনুযায়ী তার ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্যগুলি সূচিত হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে কোন জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের দেহাংশগুলির অনুপাত বৃদ্ধির হার ইত্যাদি বিষয়ে সন্তান-সন্ততিরা তাদের পিতা-মাতাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকেই অনুসরণ করে চলে।

কোন একজন বিশেষ ব্যক্তির শারীরিক ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির নিয়ন্ত্রণেণ জীনগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে নিয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু পরিবেশের প্রভাব কতখানি? এব্যাপারে বলা যেতে পারে পরিবেশ প্রভাবকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। বরং বলা চলে যে কোন ব্যক্তির যাবতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণে বংশগতি এবং পরিবশের এবং সময়ের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। যে কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক গঠনে বংশগত বন্ধু এবং পরিবেশ উভয়েরই প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ও। এদের কোন একটিকে অপরটি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ একথা বলা ঠিক হবে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে মানুষের নিষিক্ত ডিম্বাণুর ভিতর জীনবহনকারী ক্রোমোজোম না থাকলে সেটির বিকাশ যেমন সম্ভব হত না, তেমনই মাতৃগভের পরিবেশ থেকে সেটিকে অপসারিত করলে যথাযথ পুষ্টি, উত্তাপ ইত্যাদি অভাবেও তার বিকাশ সম্ভব হত না। প্রকৃত পক্ষে জীনের কার্যক্রম পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। দেহাভ্যন্তরে এই পরিবেশ বলতে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সাইটোপ্লাজম ও ঐ কোষের অবস্থান ইত্যাদিকে বোঝায়। আবার জীনের কার্যক্রম প্রসঙ্গে আর একটি কথা গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন জীনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষমতা (পেনিট্র্যান্স) এবং প্রকাশের মাত্রার (এক্সপ্রেসিভিটি) উপর জীন নিয়ন্ত্রিত ঐ নির্দিষ্ট চরিত্রটি কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেবে কিনা নির্ভর করে। জীনের এই দুটি ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও পরিবেশ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের ব্যক্তিত্ব বংশগতি ও পরিবেশের উভয়েরই মিলিত প্রভাবে গড়ে ওঠে। ম্যাকাইভার ও পেজ-এর বক্তব্য দিয়ে এই প্রসঙ্গে উপসংহার টানার চেষ্টা করবো। ম্যাকাইভার ও পেজ-এর বক্তব্য হল, "All the qualities of life are in the heredity, all the evocation of qualities depends on the environment." অর্থাৎ জীবনের সকল বৈশিষ্ট্যগুলি নিহিত থাকে বংশগতির মধ্যে আর এই বৈশিষ্ট্যগুলির সর্বপ্রকার বিকাশ নির্ভর করে পরিবেশের উপর।

৫.৬.৫ শিশুর জৈবিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা (Role of environment on biological development of child) :

মানব শিশুর বিকাশের ধারাকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়, একটি হল জৈবিক বিকাশ এবং অন্যটি হল সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ। শিশুর জৈবিক বিকাশে পরিবেশের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

১) মায়ের স্বাস্থ্য, গর্ভস্থ পরিবেশ ও রক্তের প্রকৃতি

২) খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ

৩) শিশুর বয়সের পর্যায়
৪) শিশুর হরমোণতন্ত্র
৫) ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উৎস
নিম্নে এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) মায়ের গর্ভস্থপরিবেশে, স্বাস্থ্য ও রক্তের প্রকৃতি :

মানবশিশুকে ভ্রূণ অবস্থা থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থান করতে হয়। এই অবস্থানের সময়কাল প্রায় ২৮৭ দিন। এই সময়কালে শিশুর ক্রমবিকাশের পরিবেশ হল মাতৃগর্ভ এবং তার সামগ্রিক স্বাস্থ্য। প্রকৃত পক্ষে মানবশিশুর পরিবেশের সূচনা হয় তার জোইগোট অবস্থায় মাতৃগর্ভে আবির্ভাবকাল থেকে। আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে মানব শিশু বেশীরভাগ সময় যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি নিয়ে জন্মায় তার বেশীরভাগই মাতৃগর্ভের পরিবেশ দূষণজনিত। মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (দু সপ্তাহ পর) ভ্রূণটি জরায়ু সংলগ্ন একটি থলির মধ্যে থাকে। থলিটি একটি জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে, একে বলা হয় অ্যামনিয়টিক জলীয় পদার্থ (amuistic fluid)। এই জলীয় পদার্থের গঠন দূষণমুক্ত থাকা জরুরী।

মানবশিশুর আদি পরিবেশ এই মাতৃগর্ভের পরিবেশেও অনেকা সময় কোন কোন ভাইরাস ফুল বা প্লাসেন্টার মধ্য দিয়ে ভ্রূণকে সংক্রামিত করতে পারে। তাছাড়া, এই সময় মায়ের অসুস্থতা, মায়ের হাঁটা চলা ফেরা ও মানসিক অবস্থা প্রতিকূল হলে তা গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি সাধন করতে পারে।

মাতৃগর্ভস্থ শিশুর পরিবেশ আরো একটি কারণে দূষিত হয়, তাহল মায়ের নেশাগ্রস্ত হওয়া। গর্ভবর্তী নারী যদি ধূমপান বা অন্যকোন মাদক দ্রব্যে আসক্ত হন, তাহলে অনেকক্ষেত্রেই তাঁর সন্তান পরিণত হওয়ার আগেই ভূমিষ্ঠ হয় (pre-mature delivery)। এই ধরনের ঘটনায় শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মানব শিশুর বিকাশের পথে আর একটি অন্তরায় হল গর্ভবর্তী মায়ের শরীর তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা বা ক্ষতিকর বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হলে গর্ভবর্তী মায়ের রক্তের মধ্যে যে Rh ফ্যাক্টর থাকে, তার সাথে শিশুর রক্তের Rh এর অসংগতির ফলে জন্মের আগেই সন্তানের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

২) খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ :

প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই শিশু তার জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উপযোগী সমস্ত উপকরণগুলি লাভ করে। শিশুর পুষ্টি ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য যে খাদ্য প্রয়োজন তা সে পায় উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল থেকে। সংগৃহীত খাদ্যের মাধ্যমেই শিশু তার সমস্ত জৈবিক সক্রিয়তা বজায় রাখতে পারে। অপুষ্টি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। যে সব ছেলেমেয়ে দারিদ্র্যের কারণে ক্ষুধাপীড়িত থাকে তাদের দৈহিক বৃদ্ধি প্রাথমিক অবস্থা থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। এদের অস্থি কাঠামোও সুগঠিত হয় না।

৩) শিশুর বয়সের পর্যায় :

শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দেহে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। কোনো কোনো জিনোটাইপের উপস্থিতি কেবল নির্দিষ্ট বয়সের পরেই ফিনোটাইপে প্রকাশিত হয়। মানুষে রক্তের শ্রেণির অ্যান্টিজেনের নিয়ন্ত্রক জীনের প্রভাব জন্মের আগে থেকেই নির্ধারিত হয়। আবার মানুষের বিভিন্ন

রোগ যেমন অ্যালক্যাপটোবিউরিয়া রোগের জীনের প্রকাশ হয় জন্মের পরে। ভিটামিন-D প্রতিরোধক রোগের প্রকাশ হয় এক বছর বয়সে। Juvenile amaurotic idiocy রোগ 5-10 বছর বয়সে হয়। নির্দিষ্ট প্যাটার্নের মাথার ঢাকের প্রকাশ হয় 20-30 বছরের মধ্যে। ডায়াবেটিস রোগ দেখা দেয় 40-60 বছর বয়সের মধ্যে।

৪) শিশুর হরমোন তন্ত্র :

মানব শিশুর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর একটি দরকারী বিষয় হল হরমোনের প্রভাব। হরমোন গ্রন্থি (অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি) নামে এক বিশেষ ধরনের দেহকলা থেকে হরমোন নামে এই জৈব রাসায়নিক বস্তুটি নিঃসৃত হয়। মানবদেহে বৃদ্ধির জন্য তিনটি হরমোন বিশেষভাবে কার্যকরী। এগুলি হল থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত থাইরক্সিন হরমোন, পিটুইটারী নিঃসৃত STH বা সোমাটোট্রাফিক হরমোন, GTH বা গোনাডোট্রাফিক হরমোন। অ্যাড্রিনালিন হরমোনটিও বিশেষভাবে কার্যকরী। এই সমস্ত হরমোনগুলির গভীরতর এবং জটীল কার্যকলাপের ফলেই কৈশোরকালীন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত ও পরিচালিত হয়।

৫) ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উৎস :

জাতিগত বৈসাদৃশ্যও মানবশিশুর বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক উৎসের বিচারে বিশ্লেষণের দ্বারা জাতি সমূহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ধারা নির্ণিত হয়। এই বিশেষ ধারাও বংশগতি ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নিবদ্ধ। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে এই কারণে দৈহিক উচ্চতার মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ভিন্ন ধরনের এবং ভিন্ন মাত্রার জলবায়ু ও সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ মানবশিশুর বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। দেখা গেছে উচ্চ অক্ষাংশে বসবাসকারী অধিবাসীদের বক্ষদেশের পরিধি এবং ফুসফুসের আকার সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী অধিবাসীদের অপেক্ষা বড় হয়।

পরিবেশের এই উপাদানগুলির মানবশিশুর বৃদ্ধিতে যে প্রভাব আমরা দেখলাম, তাতে বলা যে, সুস্থ ও স্বাভাবিক দূষণমুক্ত পরিবেশ যেমন মানবশিশুর বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়তা করে ঠিক তেমনি অস্বাস্থ্যকর, অস্বাভাবিক ও দূষণযুক্ত পরিবেশ, দূষিত ও ভেজাল খাদ্যবস্তু শিশুর বৃদ্ধিকে মন্দীভূত করে দেয়। রোগ, ভগ্নস্বাস্থ্য, শারীরস্থানিক বিশৃঙ্খলতা (physiological disorder) শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বাধা দেয়।

৫.৬.৬ শিশুর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা (Role of environment on social and cultural development of child) :

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় তার নিজস্ব ভাবধারা এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা এবং আচার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ নিজস্ব রূপ লাভ করে। কোনো একটি বিশেস সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ সেই সমাজের সামাজিক অনুশাসনগুলি মেনে চলেন এবং চলতে বাধ্য হন। নিজের নিজের সামাজিক অনুশাসন অনুযায়ী মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলেন। এইভাবে সামাজিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিই হল সামাজিকীকরণ। এটিই সমাজ জীবনের ভিত্তি, সমাজবদ্ধ মানুষের সন্তান-সন্ততিরা সেই ধারাকেই বহন করে নিয়ে চলে আর রচনা করে তাদের সাংস্কৃতিক জীবন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে কীভাবে এই সামাজিকীকরণের

ঘটনা ঘটে? পরিবেশ কীভাবে এই বিষয়ে ভূমিকা পালন করে? এখানে আমরা মানবশিশুর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো।

শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশ্বপ্রকৃতি এবং সমাজ উভয় পরিবেশই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক বিকাশে বিশ্বপ্রকৃতির ভূমিকা নিম্নরূপ—

১) জ্ঞানার্জন : মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিই হল জ্ঞানলাভের হাতিয়ার। বিশ্বপ্রকৃতির প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থানকালে মানবশিশু একদিকে যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে যথাযথ ব্যবহার করে ক্রিয়াশীল বা কার্যকরী গড়ে তোলার সুযোগ পায়, তেমনি অন্যদিকে প্রকৃতির সামগ্রী থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে যা তার সমাজ সংস্কৃতিতে কাজে লাগাতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ধারণা শিশু প্রকৃতি থেকেই লাভ করতে পারে। প্রকৃতি পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে শিশু নিজেকে এবং সমাজকে উপলব্ধি করতে শেখে।

২) শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ : প্রকৃতির রাজ্যে সংঘটিত সমস্ত ঘটনা নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে। ঋতু পরিবর্তনের বিষয়, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও ক্রিয়াপ্রণালী সবই নিয়মের অধীন। প্রকৃতির এই নিয়মানুবর্তিতা শিশুর জীবনে শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ ঘটায়।

৩) সৌন্দর্যবোধের বিকাশ : প্রাকৃতিক পরিবেশ মানবশিশুর সামনে সব সময় তার সামঞ্জস্য রূপ তুলে ধরে। বৃক্ষের শাখায় শাখায় পত্রবিন্যাস, ফুলের দলমণ্ডলের সজ্জারীতি, বর্ণবৈচিত্র্য, বর্ণবিন্যাস শিশুমনে এক সামঞ্জস্যের ধারণা গড়ে তোলে। আবার পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, ঝরণা, নদী কিংবা সমুদ্রের অবস্থান শিশুর সামগ্রিক চেতনায় এক নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। স্বাভাবিকভাবেই মানবশিশুর সৌন্দর্যবোধের বিকাশে প্রকৃতির মহামূল্যবান ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। এই সৌন্দর্যবোধই শিশুকে করে তোলে কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী প্রভৃতি।

৪) আবেগমূলক বিকাশ : প্রতিটি মানুষই প্রকৃতিতে স্বাধীন। মানুষের স্বতস্ফূর্ত চিন্তা চেতনার মুক্তি ঘটে, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সমস্ত অনুভূতিকে সে লাভ করে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটেই। আবার এই আবেগ বা প্রক্ষোভগুলিকে উপলব্ধির সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই।

৫) সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ : প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত জীবজগৎ এর মধ্যেও আছে সমাজবদ্ধতা। দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে গিয়ে এরাও দেখায় অকত্য স্নেহ, সমবেদনা, সহযোগিতার মনোভাব, প্রতিদ্বন্দ্বীতার মানসিকতা প্রভৃতি। প্রকৃতির রাজ্যেএই পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানবশিশু প্রাথমিক পর্যায়ে অনুকরণ করে থাকে। এমনকি প্রকৃতির মধ্যেই স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রযুক্তি, মানুষের বুদ্ধি বিবেচনায় যা বিস্ময়কর। প্রকৃতির এই প্রাণচাঞ্চল্য সজীবতায় সিক্ত প্রযুক্তির বিকাশও শিশুকে আকৃষ্ট করে, যা পরবর্তীকালে তার উন্নত চিন্তা চেতনা সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করে।

সুতরাং মানবশিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনবিকাশের প্রাথমিক দায়িত্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকখানি গ্রহণ করে থাকে। আধুনিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হল মানবশিশুকে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে তোলা, সেক্ষেত্রে বলা যায় বিশ্বপ্রকৃতি বা প্রাকৃতিক পরিবেশ শিশুর জীবনে স্বাভাবিক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

শিশুর-সামাজিক বিকাশে সমাজ এক বিশাল দায়িত্ব পালন করে থাকে। মানুষেণ সমাজগঠনের তাগিদ আর সমাজের মানুষকে সামাজিক করে তোলার তাগিদ যেন একে অন্যের পরিপূরক। আমরা এখানে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

সমাজের ভূমিকা (Role of Society) :

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু এই 'সমাজ' বলতে কী বোঝায়। 'সমাজ' কথাটির কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক 'সমাজের' বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। অধ্যাপক ম্যাকাইভার (MacIver) সমাজের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে— "Society is a system of usages and procedures, of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behaviour and of liberties." অর্থাৎ, "সমাজ হচ্ছে বিভিন্ন প্রথা ও পদ্ধতির, কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার বহু সংখ্যক গোষ্ঠী ও শ্রেণিবিভক্তির মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের একটি সমগ্র ব্যবস্থা"। ম্যাকাইভার সামাজিক সম্পর্কের পুরো ব্যবস্থাটিকেই বলেছেন সমাজ। ম্যাকাইভার সি. এইচ কুলী C.H. Cooley)-এর মতো সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজকে আবার একটি প্রক্রিয়া হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। ম্যাকাইভারের মতে, সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের জাল (ever-changing web of social relationships)। মানুষে মানুষে অবিরাম বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আন্তঃক্রিয়া চলতেই থাকে। এই আন্তঃক্রিয়ার পরিণতিতে ঘটে সামাজিকীকরণ। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির সারা জীবনব্যাপী বর্তথমান থাকে। সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি গোষ্ঠীজীবনের রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলি আয়ত্ত করে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে ক্রিয়াশীল কতকগুলি উপাদান হল— অনুকরণ (imitation), অভিভাবন (suggestion), অঙ্গীভূত করণ (identification) এবং ভাষাশিক্ষা (language learning)। এই সমস্ত উপাদানগুলির দ্বারা শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়ে যায় জন্মলাভের পর থেকেই। শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল— পরিবার, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী, বিদ্যায়তন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, রাষ্ট্র ইত্যাদি। সংক্ষেপে এদের আলোচনা করা হল।

১। পরিবার (family) :

পরিবারে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন— "The family is group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of the children." অর্থাৎ "পরিবার হল যৌন সম্পর্ক দ্বারা সংজ্ঞায়িত এমন একটি গোষ্ঠী যা সন্তানসমূহের প্রজনন ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী।"

পরিবারের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। সেগুলি হল :

(i) পরিবার একটি স্থায়ী এবং সর্বজনীন সংস্থা।
(ii) পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধ এবং রক্ত সম্পর্কের আবেগপূর্ণ বন্ধন থাকে।
(iii) পরিবারের একটি সাধারণ বাসস্থান থাকে।
(iv) পরিবার একটি অর্থনৈতিক এবং সহযোগিতামূলক সংস্থা।
(v) পরিবারের সদস্যরা পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে স্বীকৃত।
(vi) পরিবারই হল শিশুর জন্মস্থান এবং প্রথম সামাজিক পরিবেশ।
(vii) পরিবারের গঠন প্রকৃতি সতত পরিবর্তনশীল। মৃত্যু, বিবাহ-বিচ্ছেদ পরিবারের আয়তনকে পরিবর্তিত করে।
(viii) পরিবারের ধারা অনুসারে শিশুদের মানসিক গঠনে পরিবার দায়বদ্ধ।

শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে পরিবারের কার্যাবলী :

১) শিশুর জন্ম ও পরিচর্যা : মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে কোনো একটি বিশেষ পরিবারে। বাবা-মা সেই পরিবারের সদস্য। শিশু জন্মকালে থাকে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায়। সেই সময় বেশ কিছুদিন তাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে দেখাশোনা বা পরিচর্যা করতে হয়। পরিবারের প্রধান কাজ হল শিশুর সেই পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

২) শিশুর মানসিক গঠনের ব্যবস্থা : পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসার বন্ধন বিশেষভাবে পরিস্ফুট। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের ভালবাসার সম্পর্ক, পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রতিশ্রুতি, বিভিন্ন অবস্থায় সুখ-দুঃখের সমবণ্টনের নীতি শিশুর মনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

৩) শিশুকে সামাজিক মর্যাদা দান : সামাজিক ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিচিতি ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তর সমাজজীবনে পারিবারিক পরিচিতির নিরিখে ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুর মর্যাদা রক্ষায় পরিবার এইভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারের সুনামের পর্যায় অনুসারে তার সদস্যদের (শিশুরও) সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে।

৪) শিশুর সামাজিকীকরণ : মানবশিশুর সামাজিকীকরণের সূচনা ঘটে পরিবারের মধ্যেই। জন্মের পর শিশুকে সমাজ-জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য পরিবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করে। পরিবারে মধ্যে থেকেই শিশু শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিক আদর্শ, সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ রপ্ত করে। পরিবারের মধ্যে অবস্থানের দ্বারা শিশুর মধ্যে 'আমরা বোধ' (we feeling) জাগ্রত হয়। পরিবার পরবর্তী প্রজন্ম 'শিশুর' হাতে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তুলে দেয়।

৫) শিশুর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গঠন : প্রতিটি পরিবার সমাজের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং এতে অংশগ্রহণে প্রত্যেককেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে। পিতা-মাতা ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের কাছ থেকে শিশু ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়। পারিবারিক ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মবোধ শিশুর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ধর্মীয়ক্ষেত্রেও উদার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে পরিবার সহায়তা করে থাকে।

৬) শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বপালন : শিশুর প্রারম্ভিক বিষয় হল ভাষাশিক্ষা। মানবশিশুর ভাষা বিকাশ ঘটে পরিবারের মধ্যেই। শিশুর ভাষাজ্ঞান, শব্দভাণ্ডার, বাক্যবিন্যাস, প্রকাশভঙ্গি সবই নির্ভর করে পরিবারের সদস্যদের সাংস্কৃতিক পরিচয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গুণগত মান অনুসারে। আবার প্রথাগত শিক্ষার প্রস্তুতিতে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পূর্ব শর্ত হিসাবে কিছু প্রাসঙ্গিক শিক্ষা আচরণ ও অভিজ্ঞতা প্রদান করে এই পরিবার। পরবর্তীকালে প্রথাগত শিক্ষায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণেও পরিবার বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২। বিদ্যালয় (School) :

শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে দায়িত্ব পালনে পরিবারের মত বিদ্যালয় যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পালন করে। আধুনিককালে পরিবার থেকে আলাদ হয়ে ভিন্ন ধারায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যালয়গুলি সমাজে অধিষ্ঠান করে থাকে। সাধারণভাবে বিদ্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত যে আলয় বা গৃহ তাই হল বিদ্যালয়। সেই অর্থে যে কোন বয়সের মানুষের জন্য শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীর বয়স অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন— প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়,

মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন— (i) নিজস্ব অবস্থান ও বাড়ি, (ii) একদল শিক্ষার্থী, (iii) নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম, (iv) নির্দিষ্ট শিক্ষক, (v) প্রয়োজনীয় কতকগুলি আসবাব পত্র ও সরঞ্জাম, (vi) নির্দিষ্ট পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা :

১) শিশুর জ্ঞানমূলক বিকাশ : বিদ্যালয় প্রবেশের পূর্বে শিশু অনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রকৃতি এবং পরিবার ও সমাজের অন্যান ক্ষেত্র থেকে যে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করে থাকে তা-ই তার যথেষ্ট নয়। তার সাংস্কৃতিক দিকের উন্নয়নের জন্য অবশ্য জ্ঞানভাণ্ডারকে বৃদ্ধি করতে হয়। শিশুর এই জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় বিশেষ দায়িত্বপালন করে থাকে। বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময় অনুসারে নির্দিষ্ট বিষয়সূচি মেনে শিক্ষক যে পাঠক্রম করেন, তার একটা বড় অংশে থাকে তথ্যভাণ্ডার। এই তথ্যভাণ্ডার ও জ্ঞানভাণ্ডারকে শিশু আপন বুদ্ধিমত্তায় গ্রহণ করে তার সাংস্কৃতিক জগতের বিস্তার ঘটায়।

২) শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন : শিশু শিক্ষার্থীদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যাতে বিপথে চালিত না হয়, যাতে তাদের মধ্যে বুদ্ধি সৃজনশীলতা, জ্ঞানবোধ, যুক্তি ও বিচার ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে তার ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়। শিশু শিক্ষার্থীদের বয়স, ক্ষমতা, মনের প্রকৃতি, আগ্রহ, রুচি অনুসারে জ্ঞান-বোধ-দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করা বিদ্যালয়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৩) সামাজিক বোধের উন্মেষ : বিদ্যালয়ের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন থাকে। শিশু শিক্ষার্থীদের এই সব নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করতে গিয়েই তাদের আরো কতকগুলি সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে, যেমন— সহযোগিতা, সমবেদনা, পারস্পরিক মমত্ববোধ ইত্যাদি। এই সমস্ত গুণগুলির ভিত্তিতেই তার মধ্যে গড়ে সামাজিক বোধ বা সামাজিকীকরণের বোধ।

৪) গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ : শিশু শিক্ষার্থীরা যাতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে তার ব্যবস্থাও করে বিদ্যালয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে শিশুকে উন্নত ধরনের জ্ঞান, নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত ধারণা। মানবিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সংক্রান্ত ধারণাও থাকা দরকার। বিদ্যালয় এই দায়িত্ব যথেষ্ট্য দক্ষতার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করে।

৫) অতীত ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও নূনতজ্ঞানের পুনঃসৃজন : বিদ্যালয়-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অতীত ঐতিহ্যের সংরক্ষণ। মানুষ বংশ পরম্পরায় যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সেগুলিকে মানুষের জীবনের ক্রমোন্নতিতে কাজে লাগানোর জন্য পরবর্তী প্রজন্মের শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রন্থাগারের মধ্যে, সামগ্রিক কার্যধারায় কোন অংশে সংরক্ষিত করে রাখার দায়িত্ব পালন করে বিদ্যালয়। আবার এই বিদ্যালয় বিশেষ মানবগোষ্ঠীর অতীত ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, ভাবধারা, সংস্কার, রীতিনীতি বিশ্বাসকে পরবর্তী প্রজন্মের শিশু শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চালন ঘটায়। ফলে ঐতিহ্যের ধারাটি প্রবহমান থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র অতীত ঐতিহ্যই বর্তমান জীবনের অগ্রগতিকে বজায় রাখতে পারে না, তাই প্রয়োজন হয় নূতন জ্ঞানের উন্মেষ, নূতন অভিজ্ঞতার জন্ম বা পুনঃসৃজন। অভিজ্ঞতার নূতন নূতন উন্মেষ বা পুনঃসৃজনের মাধ্যমে মানব সমাজের প্রগতির সাধন সম্ভব হয়। বিদ্যালয় এই কাজটিও করে শিশু শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেই।

৩। অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী :

সমবয়সীদের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীও শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমবয়সীদের শিশুর সম্পর্ক হল সখ্যতার সম্পর্ক। এই ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে

অনেক কিছু আয়ত্ত করে। শৈশবে ও কৈশোরে মানুষ অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর কাছ থেকে এমন অনেক বিষয় জানতে পারে যা পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছ থেকে আয়ত্ত করতে পারে না, আয়ত্ত করা ততটা সম্ভব নয়। আধুনিক জীবনের অনেক ফ্যাশন, আদব কায়দা, কিংবা আধুনিক প্রযুক্তিমূলক দ্রব্যসামগ্রী একমাত্র অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর কাছ থেকে শেখা যায় বা জানা যায়। সুস্থ সমাজ জীবনের স্বার্থে শিশুর এই সমস্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বিনোদনের জন্য সময় কাটানোর প্রসঙ্গেও অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। খেলার মাঠে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীই সমাজচেতনা ও 'আমরা-বোধ' গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান :

'ধর্ম' কি? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক এমিল ডুর্কহেউমের মতানুসারে ধর্ম হল পবিত্র বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিশ্বাস ও সুসংবদ্ধ আচরণ প্রণালী। যা কিছু পার্থিব, অলঙ্ঘনীয় ও উচ্চস্তরের তাই পবিত্র বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়। পবিত্র বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস ও আচরণের অনুগামী মানুষ সংযুক্তভাবে একটি সুসংবদ্ধ নৈতিক জনগোষ্ঠী গঠন করে। চার্চ হল এই রকম একটি জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠানিক রূপ। চার্চ-এর মত অনুরূপ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাদেরকে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

মানবশিশুর সামাজিক জীবনে ধর্মের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে

(i) ব্যক্তি মানুষের আচর-ব্যবহার এবং সমাজ জীবনের ধারা ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম মানুষকে সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলতে সাহায্য করে।

(ii) সমাজ জীবনে অনেক সময় মানুষ বহুবিধ যন্ত্রনার মধ্যে পড়ে। ধর্মবোধ তখন মানুষকে যাবতীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে হতাশার সমাপ্তি ঘটায়।

(iii) ধর্মই অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চরিত্র গঠন করে এবং এই সূত্রে কার্যকরভাবে সমাজ জীবনকেও প্রভাবিত করে।

(iv) প্রত্যেক সমাজে সামাজিক সংহতি বজায় রাখার ব্যাপারে যে সকল ভাবানুভূতি অন্যকথায় যে সকল আদর্শ, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি কার্যকর থাকে, ধর্ম সেগুলির অন্যতম সঞ্চারক ও সংরক্ষক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

(v) ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধে তুলে তাকে পরার্থমূলক কাজে প্রবৃত্ত করে। সমষ্টিগত জীবনযাপনে নতুন ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের প্রবর্তন করে।

(vi) সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পশ্চাতেও অনেক সময় ধর্মের পরিশীলিত ও পরিমার্জিত রূপ কাজ করে।

(vii) জনসমাজে শিক্ষার প্রচার এবং সমাজ সেবামূলক ও মানব হিতকর কার্যাবলীতেও ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকা আছে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৩ (Check your progress-3)

নির্দেশ : ..... একই বিষয় হবে .....

ক) শিশুর সৌন্দর্যবোধের বিকাশের প্রয়োজন কেন?

খ) শিশুকেও কেন মর্যাদা দান করা প্রয়োজন?

গ) শিশুর বিদ্যালয়ের দুইটি ভূমিকা লেখ।

৫.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

এই অধ্যায়ে শিশু ও তার পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ বলতে বোঝানো হয়েছে যে উদ্দীপক যুক্ত পরিস্থিতি যার প্রভাবে শিশুর ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটায়। পরিবেশের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ঐ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে পরিবেশকে কতগুলি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন উপাদানগুলির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

পরিবেশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরিবেশগত অনুভূতি বা পরিবেশগত বেদন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রূপ, সিদ্ধান্ত ও কর্ম প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে তার পরিবেশগত বেদন।

পরিবেশগত বেদনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।

মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় হল তার শৈশব। আর এই শৈশবের পরিবেশ শিশুর সমস্ত জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। কারণ পরিবেশ শব্দটির অর্থ ব্যাপক; কাজেই জৈবিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ শিশুর ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে যুক্ত শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশের বিভিন্ন দিক। তবে শিশুর জীবনের বিকাশ ও বৃদ্ধিতে বংশগতির প্রভাবও কম নয়।

৫.৮ অনুশীলনী (Exercise)

ক) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রতিটি ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) পরিবেশ কাকে বলে?

(ii) গ্রামীন পরিবেশ কি?

(iii) পরিবেশগত বেদনের পর্যায়গুলি কি কি?

(iv) শিশুর জীবন বিকাশের স্তরগুলি কি কি?

খ) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রতিটি ৩০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) মানুষ্য ও পরিবেশের মধ্যে সম্বন্ধ কি?

(ii) নবনিয়ন্ত্রণবাদ বলতে কি বোঝেন?

(iii) শিশুকে কি ভাবে পুষ্টি সরবরাহ করা উচিত?

গ) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রতিটি ৫০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) শিশুর জৈবিক ধারণার ব্যাখ্যা দিন।

(ii) শিশুর সাংস্কৃতিক বিকাশ বলতে কি বোঝেন?

(iii) শিশুর জীবন বিকাশে বংশগতির ভূমিকা কি?

(iv) শিশুর জীবনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা কি?

৫.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত (Hints of answer to check your progress)

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-১

(ক) আমাদের পরিধির ভেতর যা আমাদের প্রভাবিত করে।

(খ) পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

(গ) সক্রিয়তা এবং ব্যপকতা

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-২

ক) পাঁচ প্রকার, খ) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান গুলি হল জড়, সজীব উপাদান মানুষ ইত্যাদি। গ) মানুষের কর্ম প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক পরিবেশ চরম নিয়ন্ত্রক না হলেও তার প্রভাব মানব জীবনে প্রভাব ফেলে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৩

ক) সৌন্দর্যবোধের বিকাশ শিশুর ভবিষ্যত জীবনে তাকে কবি, শিল্পী, সাহিত্য করে তোলে। খ) সামাজিক পরিমণ্ডলে শিশুর মর্যাদা পাওয়া দরকার। কারণ এর উপর শিশুর বিকাশ অনেক অংশে নির্ভরশীল। গ) জ্ঞানমূলক বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠন।

একক ৬ ❑ শিশুর পরিবেশ (Child's Environment)

গঠন **(Structure)**

৬.১ ভূমিকা **(Introduction)**

৬.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৬.৩ শিশুর পিতা-মাতার দায়িত্ব **(Responsibility of parents)**

৬.৩.১ শিশুর শারীরিক বিকাশ ও যত্ন-পরিচর্যা **(Physical growth, care and protection of child)**

৬.৩.২ শিশুর মন, আবেগ ও সমাজ সত্তার বিকাশে বাবা-মায়ের দায়িত্ব **(Parental responsibilities for the development of mind, emotion and social self of child)**

৬.৪ শিশুর জীবন বিকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব **(Responsibilities of teachers for the growth and development of child)**

৬.৫ সারসংক্ষেপ **(Summary)**

৬.৬ অনুশীলনী **(Exercise)**

৬.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত **(Hints of answer to check your progress)**

৬.১ ভূমিকা (Introduction)

একটি পরিবারে যে কোন নব দম্পতির প্রত্যাশার বাতাবরণ তৈরি হয় করে একটি নতুন শিশুর আবির্ভাব ঘটবে। মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের প্রথম কিংবা পরবর্তী স্বাদ গ্রহণের অপেক্ষায় থাকেন। যে নতুন অতিথি পরিবারে আসে তার জন্য সারা পরিবার তৈরি হতে থাকে একটা আলাদা পরিবেশ। তারপর নবজাতককে ঘিরে প্রতিটি দম্পতিই সন্তান পালনের ক্ষেত্রে কতকগুলি সহজাত ধারণা, পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা, সমাজ স্বীকৃত কিছু রীতিনীতিকে ভিত্তি করে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর উদ্দেশ্য হল শিশু সন্তানের দৈহিক, মানসিক, আবেগমূলক চাহিদা পূরণ, নিরাপত্তা প্রদান এবং তার সামগ্রিক জীবনবিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। বাবা-মায়ের সেই দায়িত্বের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরির জন্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি শেষ করার পর আপনি—

- শিশুর জীবনের পিতা-মাতার বিভিন্ন দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে, বুঝতে ও প্রয়োগ করতে পারবেন;
- শিশুর জীবন বিকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকার বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য জানতে পারবে এবং প্রয়োগ করতে পারবে।

৬.৩ শিশুর বাবা-মায়ের দায়িত্ব

বাবা-মায়ের দায়িত্বগুলিকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) শিশুর শারীরিক বিকাশ ও যত্ন পরিচর্যা এবং

(ii) শিশুর মানসিক, প্রাক্ষেভিক ও সামাজিক বিকাশ

৬.৩.১ শিশুর শারীরিক বিকাশ ও যত্ন-পরিচর্যা (Physical growth, care and protection of child) :

ক) গর্ভধারণকারী ভাবী মায়ের দায়িত্ব

১) মানবশিশুর আদি পরিবেশ হল মাতৃগর্ভ। এই মাতৃগর্ভকে সব দিক থেকে সুরক্ষিত রাখা মায়ের দায়িত্ব। মা যাতে নিজে কোনো ভাবেই কোনো বড় অসুখে না পড়েন, ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে নিজেকে সাবধানে রাখা দরকার। অসুস্থ হয়ে পড়লে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণকরা উচিত। সংক্রমক রোগ থেকে তিনি যেমন সাবধান থাকবেন তেমনি কোনরকম আঘাত যেন না পান সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২) গর্ভবতী মায়ের ওঠাবসা, হাটাচলা ফেরার ত্রুটির জন্য কিংবা কোনরকম অস্বাভবিক অবস্থায় বসে বা শুয়ে থাকার কারণে ভ্রূণের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে সেই ব্যাপারে মা'কে সাবধানে থাকতে হবে।

৩) ভাবী মায়ের কোনভাবেই নেশা বা কোন মাদকদ্রব্য সেবন-এ আসক্তি থাকা উচিত হবে না।

৪) মায়ের পুষ্টিতে শিশু/ভ্রূণের পুষ্টি লাভ। তাই মায়ের পুষ্টির জন্য মা'কে সদা সর্বদা সতর্ক থাকবে হবে। অপুষ্টি জনিত অবস্থায় যে মা ভোগেন তার গর্ভস্থ পরিবেশ শিশুর পক্ষে যথার্থ অনুকূল অবস্থা নয়।

৫) মায়ের কোনভাবেই মারাত্মক উদ্বেগ থাকা ঠিক নয়। ভয়, মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, উত্তেজনা, ঈর্শা, অস্বাভাবিক চিন্তা মানব ভ্রূণের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে পারে।

খ) সদ্যজাত শিশুর পরিচর্যা :

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই নবজাতক হাই তোলা, হিক্কা তোলা, ভ্রূ কোঁচকানো, মাথাকে সামান্য তোলা বা নাড়ানোর কাজ করতে পারে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা শিশু তার শ্বাস প্রক্রিয়াকে ক্রমশ সহজ করে তোলার চেষ্টা করে। আলোক সংবেদনে সে সাড়াও দেয়। তার চোষার ক্ষমতা, গেলার ক্ষমতা ও খাওয়ার জন্য মুখ নাড়ার ক্ষমতাও থাকে। এগুলি স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাচ্ছে কি না তা

নবজাতকের মা-কে ভীষণভাবে খেয়াল রাখতে হবে। কোন রকম অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ্য করলেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি অথবা চিকিৎসকের গোচরে আনতে হবে। প্রি-ম্যাচিয়োর বোধ জন্ম গ্রহণ করলে মায়ের সচেতনতা ও দায়িত্ব এই ব্যাপারে কিছুটা বেড়ে যায়। সদ্যজাত শিশুর প্রতি এই পরিচর্যা চলে সাধারণ দু'সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত।

গ) টীকাকরণের কাজ :

যেহেতু শিশু জন্মাবার প্রথম বছর থেকেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি এবং আক্রান্ত হলে তার পক্ষে প্রতিরোধ করাও বেশ কঠিন ও প্রায় দুঃসাধ্য তাই ঐ সমস্ত রোগের হাত থেকে শিশুকে বাঁচাবার জন্য আগেভাগেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত ভাবে টীকাকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এজন্য বাবা-মা'কে অবশ্যই সচেতন হয়ে শিশুকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা নেবেন। ছয়টি রোগ যেমন ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার (tetanus), হুপিং কাশি, পোলিও মায়েলাইটিস, যক্ষ্মা (tuberculosis) এবং হাম (measles) এর রোগ প্রতিষেধক হিসাবে প্রয়োজনীয় টীকা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এছাড়াও বর্তমানে সচেতন বাবা-মা শিশুকে আরো একটু সুরক্ষিত রাখার জন্য মাম্পস, রুবেলা, জলবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জণ্ডিস প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক শিশুকে দেওয়ার চেষ্টা করেন। শিশুর এই টীকাকরণের জন্য নিয়মিতভবে চিকিৎসকের কাছে যেমন পরামর্শ নেওয়া হয় তেমনি এই কাজ বলে শিশুর পনের বছর বয়স পর্যন্ত।

ঘ) শিশুর খাওয়া-দাওয়া :

জন্মগ্রহণের পর শিশু স্বাভাবিক শারীরিক প্রয়োজনেই খেতে শেখে। এই খাওয়াতেই তার সুখ, তার আরাম আর শারীরিক ও মানসিক শান্তি। শিশুকে এই খাওয়ানোর কাজে কখনো ধরা বাঁধা সময় সূচি অনুযায়ী সম্পন্ন করা উচিত নয়, প্রয়োজনও নেই। শিশুর কান্না ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মা-কে অনুভব করতে হবে শিশুকে খাওয়ার কথা। এইসময় শিশু স্বাভাবিকভাবেই স্তনদুগ্ধ খায়। খাওয়ানোর সময় শিশুর সাথে কথা বলা, আদর করা দরকার, কিন্তু কোনরকম তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। শৈশবের প্রথম পর্বে এক বছর বয়সের মধ্যে শিশুর খাদ্যের প্রয়োজন না হলে, সে আপনা থেকে জোর করে খাওয়ানো খাদ্যকে বা অপ্রয়োজনীয় খাদ্যকে বমি করে দেয়। বেঁচে থাকার জন্যই শিশুর এই ক্ষমতাটি হল স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতিদত্ত। আধুনিককালে একটা প্রবণতা বিশেষ করে আধা-শহর ও শহরাঞ্চলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত দেখা যায় মায়েরা তাড়াতাড়ি বুকের দুধ ছাড়াবার জন্য প্রস্তুতি নেয়। এই ধরনের প্রবনতা শিশুটির পক্ষে ক্ষতিকারক। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা WHO এর এক অনুসন্ধানের ফলাফলে দেখা গেছে যে, কৃত্রিম দুধ অপেক্ষা মাতৃদুগ্ধই শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি উপকারী। মায়ের বুকের সাথে কোলাস্ট্রোল নামে যে পদার্থটি থাকে তা শিশুর রোগ প্রতিরোধের সহায়ক।

শিশু যখন আরো একটু বড় হয় তখন তার খাদ্য তালিকায় আরো কিছু জিনিস যুক্ত হয়, ফলে খাওয়াকে কেন্দ্র করে শিশুর কতকগুলি সমস্যা দেখা দেয়। খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ, ঠাণ্ড-গরম, নরম-শক্ত প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র শিশুর কিছু পছন্দ-অপছন্দ জন্মায়। বাবা-মায়ের অন্যতম কর্তব্য হল শিশুর এই পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া। খাদ্যমূল্য বজায় রেখে যে সমস্ত খাদ্য শিশুকে দেওয়া যেতে পারে সেই সমস্ত খাদ্যবস্তুকে শিশুর খাদ্য তালিকায় স্থান দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিশুর এই খাদ্য তালিকার মধ্যে শিশুর পছন্দ অপছন্দকে গুরুত্ব দিলে তা তার মানসিক বিকাশের সহায়কও।

ঙ) শিশুর মল-মূত্র ত্যাগ :

শিশু যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করেছিল তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের, আহার গ্রহণ, মলমূত্র ত্যাগ কোন কিছুর প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে পূর্বোক্ত সমস্ত কাজগুলিই করতে হয়। নতুন এই বাইরের পরিবেশের সঙ্গে শিশুকে মানিয়ে নেবার জন্য সমস্ত শারীরিক প্রক্রিয়ার ধরণও বদলাতে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন যেমন ধরনের খাদ্য প্রয়োজন তেমন তাকে গ্রহণ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যের অন্যান্য অংশ মলের আকারে এবং মলের অতিরিক্ত অংশ মূত্রের আকারে বাইরে নির্গত হওয়ার প্রয়োজন হয়। বর্জ্য পদার্থ হিসাবে 'মল' এবং রেচন পদার্থ হিসাবে মূত্র দেহকোষে থেকে গেলে তা ক্রমে কলাকোষ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়, ফলে মল-মূত্র ত্যাগের বিষয়টি শিশুর কাছে প্রাকৃতিক কর্ম হিসাবে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু শিশুর এই প্রাকৃতিক কর্ম অনেক ক্ষেত্রেই মায়েদের কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয়। শিশু বার বার বিছানা নোংরা করবে, বার বার বিছানা ধুতে হবে, পায়খানা করে নোংরা অবস্থার মধ্যে শুয়ে থাকবে, এসব মায়ের পছন্দ নয়। এইসব পরিস্থিতির বিচার বিবেচনা করে শিশুকে খাওয়ানোর পরই অনেক ক্ষেত্রে মল ত্যাগের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। অনেক সময় নির্দিষ্ট নিয়ম করে মলমূত্র ত্যাগের জন্য শেখানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ধরনের চেষ্টার কোন লাভ নেই। উপযুক্ত বয়স না হলে শিশু এই ধরনের অভ্যাস রপ্ত করতে চায় না। ফলে জোর করে শিশুকে মলমূত্র ত্যাগ করানোতে বাধ্য করলে হিতে বিপরীত হবে।

শিশুর মল-মূত্র ত্যাগ কাজে যাতে একটা নিয়ন্ত্রণ আসে সে ব্যাপারে শিশুর একটা নির্দিষ্ট বয়সের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। শিশু এক বছর বয়স না হলে মল মূত্র ত্যাগ করার ব্যাপারে বিশেষ কোন সচেতনতা দেখা যায় না। দ্বিতীয় বছরই হল শিশুর মল-মূত্র ত্যাগ করার প্রশিক্ষণের উপযুক্ত সময়। দু'বছর বয়স হলেই শিশু পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের অনুকরণ করে মল মূত্র ত্যাগ করার নির্দিষ্ট স্থানকে ব্যবহার করে। এই সময় তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া বাবা-মায়ের দায়িত্ব।

দুই থেকে আড়াই বছর বয়সে শিশু নিজে নিজে পোশাক খুলে যাতে মল মূত্র ত্যাগের নির্দিষ্ট স্থানটি ব্যবহার করতে শেখে তার ব্যবস্থা করতে হবে বাবা-মা'কে। এই সময় মল মূত্র ত্যাগের ব্যাপারে যে বাবা-মা কোনোরকম ঘৃণার ভাব না দেখায়। আবার যদি কোন কারণে শিশু অনিয়মিতভাবে যেখানে সেখানে মল মূত্র ত্যাগ করে তবে তা নিয়ে তাকে বিশেষ বকাবকি করা উচিত নয়। এতে শিশুর মধ্যে অপরাধপ্রবনতা দেখা দিতে পারে, এই ব্যাপারে বাবা-মায়ের দায়িত্ব অনেক খানি।

চ) শিশুর খেলায় উৎসাহ প্রদান :

দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর খেলার সমগ্রী ছিল বাবা-মা ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সমবয়সী বন্ধুরা। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা শিশুর নিকট খেলার সঙ্গী হিসাবে প্রতিভাত হয়। এখন তারা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে খেলা করতে শুরু করে এবং এইভাবে ক্রমশ এগিয়ে আসে বাল্যকাল, কৈশোর এবং যৌবন। খেলার মধ্য দিয়ে যেমন শিশুর মানসিক চাহিদা মেটে তেমনি সংশ্লিষ্ঠ বিকাশও ঘটে। এই খেলাকে কেন্দ্র করেই শিশুর সামাজিক বিকাশ ঘটে থাকে।

এতদিন পর্যন্ত প্রকৃত বাস্তব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শিশুকে আসতে হয়নি। কিন্তু শিশুর খেলা এমন এক ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে শিশু বাস্তব পরিস্থিতির উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। খেলার মধ্য দিয়ে সে সঙ্গীর মানসিকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। খেলার মধ্য দিয়েই অন্যান্যদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ককে যে উপলব্ধি করতে পারে।

শিশুর খেলার ব্যাপারে বাবা-মা যেন অহেতুক অবদমনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করেন। অথবা জোর করে কোন খেলাকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দেওয়াও ঠিক নয়। শরীর এবং মনের চাহিদাকে অবলম্বন করে শিশু নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যে খেলায় অংশগ্রহণ করে তাকেই সমর্থন করা উচিত। আর একটা কথা হল, শিশুর খেলায় তার যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া দরকার।

৬.৩.২ শিশুর মন, আবেগ ও সমাজসত্তার বিকাশে বাবা-মায়ের দায়িত্ব :

শিশুর ভয়, ক্রোধ ও ভালবাসা

ক) ভয় :

ভয় মানুষের জীবনে একটি মৌলিক প্রক্ষোভ বা আবেগ। বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভয় পায়। কোন একটি শিশু কোন পরিস্থিতিতে ভয় পাচ্ছে তা নির্ভর করে শিশুটির কোন পরিবেশে বড় হচ্ছে এবং কিভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে তার উপর। শিশুটির মানসিক বিকাশের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। শিশুর বাবা-মায়ের একথাটি মনে রাখা দরকার যে শিশু কোন কারণে ভয় পেলেই তাকে অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করার কোনো কারণ নেই, এর মধ্যে অযৌক্তিক বিষয়ও নেই। দেখা দরকার শিশু কোন পরিস্থিতিতে ভয় পাচ্ছে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর ভয়ের বিষয় বস্তু, ভয়ের রূপ ও প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন যদি ঘটে তবে অবশ্যই বাবা-মাকে সতর্ক হতে হবে এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিতে হবে।

শিশুর অহেতুক ভয়ের ব্যাপারে নজর রাখা দরকার তার আচরণের দিকে। মায়ের সতর্ক দৃষ্টি শিশুর ভয়ের কারণকে অনায়াসেই চিহ্নিত করতে পারে। দেখা দরকার অবাঞ্ছিতভাবে বাবা-মা যেন শিশুর মধ্যে ভয়কে অনুপ্রবিষ্ট করে না দেন। অনেক সময় বাবা-মা নিজেদের সুবিধার কথা ভেবে ভয় দেখিয়ে শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রবণতা ঠিক নয়। শিশু কোন পরিস্থিতিতে, কোন অসুবিধার কারণে ভয়ের আশ্রয় নিচ্ছে তা মা-বাবাকে সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, শিশুর মনোভাবকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিশু খেতে না চাইলে, ঘুমোতে না চাইলে, মায়ের কাছে আসতে না চাইলে তাকে ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব ভয় দেখিয়ে লাভ নেই; এতে অনেকসময় ভবিষ্যতে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

শিশু যখন ভয় পাবে তখন তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে, তাকে মানসিক সহায়তা দিতে হবে, তার মধ্যে নিরাপত্তার বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। ভয়কে মোকাবিলা করা, দূর করার জন্য খেলাধূলা, ছবি আঁকা প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। শিশু যাতে বাস্তবভাবে ভয়কে জয় করতে পারে তারজন্য বাবা-মাকে ধৈর্য্য সহকারে এগিয়ে যেতে হবে।

খ) ক্রোধ বা রাগ :

মানবশিশুর জন্মগ্রহণের প্রায় ছয় মাস বয়স থেকে মায়ের অস্তিত্ব থেকে নিজের অস্তিত্বকে আলাদা করে ভাবতে শেখে। এইজন্যই সে মা-কে কাছে কাছে রাখতে চায়, নিজের মতো করে পেতে চায়। যদি সে তার পছন্দ মতো মা-কে না পায় সে হয় ক্রুদ্ধ। বাস্তবের জগতে ক্রোধ ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে। ক্রোধের উৎপত্তি ঘটে বিভিন্ন কারণে। শিশুর ভয় থেকে যেমন ক্রোধ জন্মায়, তেমনি প্রত্যাশা পূরণ না হলে কিংবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে এমনকি বাবা-মা নিজেদের মধ্যে দ্বান্দ্বিক

পরিস্থিতিও শিশুর ক্রোধের কারণ হতে পারে। কিন্তু শিশুর মধ্যে ক্রোধের প্রকাশ দেখলেই চিন্তার কোন কারণ নেই। বাবা-মা কে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন সেই ক্রোধ শিশু, তার বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেন কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। শিশুর রাগের পরিস্থিতিতে তার মা-বাবাকে তার নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে হবে। শিশুর আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার আত্মমর্যাদায় আঘাত না পায়। অন্যের সাথে তুলনার মাধ্যমে শিশুকে কখনোই অহেতুক ছোট করা উচিত নয়।

ভয় থেকে অনেকসময় যেহেতু শিশুর ক্রোধ জন্মায়, সেজন্য বাবা-মায়ের কর্তব্য হলো শিশুর ভয়ের পরিস্থিতিগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা। শিশুদের ক্রোধের অপর একটি পরিস্থিতি হলো মায়ের কাছ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা, বিশেষ করে কর্মরতা মায়ের ক্ষেত্রে শিশু দীর্ঘ সময়ের বিচ্ছেদে অসন্তোষ এবং নিরাপত্তা হীনতার সৃষ্টি হয় যার থেকে শিশুর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হতে পারে। আবার কখনওবা তার ক্ষোভকে প্রশমিত করতে গিয়ে নিজেই কখন হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়।

শারীরিক অসুস্থতা যেহেতু শিশুর একটা ক্ষোভের কারণ তাই শিশুর খিটখিটে মেজাজ এবং ক্রোধের পেছনে কোন শারীরিক অসুস্থতার বিষয় আছে কিনা তা দেখতে হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাবা-মায়ের একথাটা মনে রাখা দরকার শক্তিশালী প্রক্ষোভ হিসাবে এই ক্রোধকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সৃজনধর্মী কাজে পরিচালিত করলে পারলে শিশুর সাথে সাথে সমগ্র পরিবারের কল্যাণ হতে পারে।

গ) ভালবাসা :

শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্ষোভ হল 'ভালবাসা'। ভালবাসার দু'টি রূপ আছে— ভালবাসা চাওয়া ও ভালবাসা দেওয়া। পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষের মধ্যে ভালবাসা চাওয়ার দিকটি পরবর্তীকালে ভালবাসা দেওয়ার মধ্যে পরিণতি লাভ করে।

শিশুর মধ্যে ভালবাসা দেওয়ার ক্ষমতার যাতে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে সেদিকে বাবা-মা'র লক্ষ্য রাখতে হবে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশু যতই বাস্তবের সংস্পর্শে আসবে ততই তার আত্ম-প্রেমের কেন্দ্রবিন্দুটি স্থানান্তর ঘটবে, বিস্তৃতি ঘটবে। এইভাবে স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই চাই শিশু জীবনে একটি উপযুক্ত পরিবেশ, ভালবাসার পরিবেশ, যা প্রথম প্রকাশ ঘটে পরিবারের মধ্যে বাবা-মায়ের সান্নিধ্যেই। ভালবাসার পরিবেশেই শিশু ভালবাসা পাবে, অন্যদেরও ভালবাসা দেবে, ভালবাসতে শিখবে। শিশুর ভালবাসার প্রথম পাঠ শুরু হয় এই বাবা-মায়ের সংস্পর্শেই। প্রতিটি বাবা-মাকেই মনে রাখা দরকার যে, তাদের ভালবাসায় শিশু যেন আত্ম-প্রেমেই নিমগ্ন হয়ে না থাকে। বাবা-মা'র ভালবাসা যেন শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে বিস্তৃতির পথ দেখায়।

অনেক সময় শিশুর ভুল-ভ্রান্তির জন্য, সামান্য দোষের কারণে শাস্তি দেওয়ার প্রবনতা দেখায় বাবা-মা। এটি কিন্তু ঠিক নয়। এতে শিশুর মধ্যে ভালবাসা চাওয়া বা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা ব্যবাধান তৈরি করে এবং শিশুর আচরণে ঘৃণা, ক্ষোভ জন্মায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার তার অবদমন ঘটলে শিশুর মনের মধ্যে বাবা-মা'র প্রতি একটা ঘৃণাবোধ জন্মাতে পারে। শিশুর দোষটিকে বাবা-মা'কে ভালবাসার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে তার সংশোধনের ব্যবস্থা করা উচিত। অন্ততঃ বাবা-মা শাস্তি দিলেও শিশুর নিকট যেন তা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে না ধরে, শিশুর মধ্যে যেন এমন অনুভূতির সঞ্চার না হয় যে, তার বাবা-মা তাকে ভালবাসে না।

শিশুর জীবন অন্যদের তুলনায় সংকীর্ণ, ছোট পরিসরে, স্বাভাবিকভাবেই শিশুর মধ্যে অল্পবিস্তর হীনমন্যতা থাকে। এই হীনমন্যতার ভাবকে কাটিয়ে তার মধ্যে আত্মনির্ভরশীল বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ভালবাসাই আসল অস্ত্র।

2) শিশুর স্বভাবকে উপলব্ধি করা : শিশুকে বোঝা বা উপলব্ধি করা বেশ কঠিন। তত্ত্বগতভাবে যতই আমরা শিশুকে বোঝার চেষ্টা করি না শিশু কিন্তু শিশুই। সে চলে তার আপন খেয়ালে। এই খেয়ালটিকেই আমরা অনেক সময় তুচ্ছ জ্ঞান করি। বড়রা শিশুদের নিতান্ত অধাচীন মনে করে তাঁদের পরিকল্পিত পথে চলতে বাধ্য করেন। ছোটদের নিজেদের মতো করে, তাদের প্রয়োজন অনুসারে বেশীরভাগ বাবা-মা চলতে রাজী নন। অভিভাবকরা অনেকসময়ই নিজেদের জীবনের অতৃপ্ত শৈশবকে তাঁর শিশুসন্তানের মধ্যে পেতে চায়। যুগ আর ব্যক্তি বৈষম্যের কথাকে গুরুত্বই দেওয়া হয় না। অথচ অধিকাংশ শিশুর মধ্যেই একটি সহজ অন্তর্দৃষ্টি এবং নিজস্ব বিবেচনা শক্তি আছে, যা দিয়ে সে তার মত করে জীবন পথে চালিত হতে পারে। আর এখানেই বাবা-মা'র একটা বিশেষ দায়িত্ব হল উপযুক্ত স্নেহ, সহানুভূতি ও সহযোগিতা দিয়ে তাঁর শিশু সন্তানকে শিশুর নিজের জগতে, নিজের মতো করে বাস্তবকে উপলব্ধির করতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

3) শিশুকে প্রশংসা ও উৎসাহ দান : আজকাল প্রায়ই একটা কথা শোনা যায় বাচ্চারা আগেকার মত বড়দের কথা মানছে না। বাবা-মা'র উপদেশ নিচ্ছে, বড়ই বেয়ারা হয়ে গেছে। এই ধরনের কথা কিন্তু ঠিক নয়। ছোট্ট চারাগাছকে যেমন বড় করার জন্য জল, মাটি, বাতাস, আলো প্রভৃতি উপাদান দিয়ে সযত্নে লালিত করতে হয়, আপনার শিশুটিকে তেমনি তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কিছু উপাদান, যেমন— প্রেরণা, উৎসাহ, ভরসা আর স্বাধীনতা দিতে হবে। এই ব্যাপারে বাবা-মা'কে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশু কোন কাজে সাফল্যের পরিবর্তে ব্যর্থা পেলে; কখনো 'ছিঃ ছিঃ বাবা এসব করে না!' কিংবা 'এভাবে করা ঠিক হয় নি।' বলা ঠিক নয়, এতে শিশুর নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। শিশুর কাজে শুধু সাফল্য খুঁজতে যাওয়া বাবা-মা'র ঠিক নয়। বরং তাকে কাজ করতে সাহায়তা করুন, ভুলটা সংবেদনশীল মন নিয়ে সংশোধন করুন। সাফল্যের সঙয় 'বাহবা' দিন। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে, প্রতিবারের কাজেই নিত্য-নতুন বাহবা পাওয়া যায়। আসল কথা হল শিশুকে কাজের সময় গোড়াতে পয় দেখানো, পরে উৎসাহ, প্রেরণা ও স্বাধীনতা দানের মাধ্যমে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।

4) শিশুদের সত্য ও মিথ্যাচার : শিশুদের বস্তু প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা এবং ধারণা গঠন ক্ষমতা যেহেতু দুর্বল, সেই কারণে কোন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে বাবা-মা বা বড়দের কাছে উপস্থাপন করা তাদের পক্ষে বেশ শক্ত। তাদের ভাষার দক্ষতা এমন উচ্চতায় থাকে না যে, সমস্ত ঘটনাকে স্বচ্ছন্দে অন্যের নিকট সহজ বোধ্য করে তুলতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের বহু ঘটনার বিবরণ দান যেমন অস্পষ্ট তেমনি অসংলগ্ন। এইজন্য শিশুদের অনেক কিছুকে আমরা তাদের মিথ্যাচার বলে মনে করি। এই ধরনের মিথ্যা অপবাদের দ্বারা শিশুরা অনেক সময় তাদের বাবা-মা ও পরিবারের বড়দের কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়। ঘটনার প্রকৃত উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে হলে, তা সত্যের মর্যাদা পায়। এই ধরনের সত্য কথা বলার ক্ষমতা সে ধীরে ধীরে লাভ করে। সততা আর সচেতনতার দৃষ্টিভঙ্গির তাকে আরো বেশি সত্যবাদী করে তোলে। এই ব্যাপারে অভিভাবক বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্যদের যেমন হতে হবে সহিষ্ণু, সহানুভূতিশীল, সৎ ও সচেতন। বাবা-মা কোনভাবেই বানানো কথাকে শিশুর সামনে উপস্থাপনা না করেন। বাবা-মা নিজেরা যেন মিথ্যাচারের আশ্রয় না নেন, বরং শিশুর স্বাভাবিক ধারণা গঠন, প্রকাশক্ষমতা আর

বাসনাকে গুরুত্ব দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে ধীরে ধীরে শিশুদের সত্যবাদিতার মতো সদ্‌গুণ বিকাশের ব্যাপারে সহায়তা করেন। দায়িত্বশীল বাবা-মায়ের আর একটি কাজ হল সত্য ভাষণে সাহস অবলম্বন করা। সত্য কথা বলাতে বাবা-মা নিজেরাই সাহসী না হলে শিশুরা কিভাবে সাহস করে সোজা সত্য কথাটা বলবে? আর একটি বিষয় বাবা মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি যেন এমন না হয় যে, ভয় ও অবিশ্বাস শিশুকে মিথ্যা কথা বলতে প্ররোচনা দেয়। বরং যদি শিশুর বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য না হয় তবে সামনা-সামনি শিশুর সত্য-মিথ্যা বিচার না করে, সন্তর্পনে আড়ালে প্রকৃত বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে।

5) শিশুর আত্মনির্ভরশীলতা : প্রথম শৈশব কাটিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ আড়াই থেকে তিন বছর বয়স থেকে শিশু মনের অজান্তেই আত্মনির্ভরশীল হতে চায়। এই সব শিশুদের একটুখানি সময় একলা থাকতে দিতে হবে, বাবা-মা'র নিজেদের কতৃত্বকে একটু সংক্ষিপ্ত করে তাদেরকে আত্মসচেতন হয়ে ছোট ছোট কাজ করতে দিলে শিশুদের আত্মনির্ভরশীলতা জন্মায়। বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দেখায়।

6) শিশুর রাগ-জেদের প্রসঙ্গ : আত্ম প্রতিষ্ঠার মনোভাবকে শিশু কাজে লাগাবার সুযোগ না পেলে তার মর্যাদালাভের সুযোগ আসে না, তাই শিশু তখন ক্ষোভ প্রকাশ করে। এই অবস্থায় তার ওপর মানসিক পীড়ন শুরু হলে সে বাবা-মা'র অবাধ্য হয়তে থাকে এবং ক্রমশ জেদী হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে বাবা-মা'র উচিত হবে শিশুটির রাগকে সহ্য করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করা। বাড়ীর পরিবেশকে রুক্ষ মেজাজী স্বভাব পরিহার করে একটু নরম ও দরদী মন নিয়ে শিশুর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে বাবা-মা ও অন্যানদের এগিয়ে আসতে হবে।

7) শিশুর হিংসা-মনোবৃত্তি : বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্নেহ করবেন, ভালবাসবেন। কিন্তু সেই স্নেহ ভালবাসার আতিশয্যে যেন সন্তানকে দখল করে রাখার মানসিকতা পোষণ না করেন, তা না হলে তাদের নিজেদের মধ্যে যে হিংসা-মনোবৃত্তি পরে দেখা দেবে, তা থেকে সন্তানরাও সেই কু-মনোবৃত্তি লাভ করবে। দখলীসত্ত্বলোভী মনোভাব যেন বাবা-মা নিজেদের মধ্যে কিংবা ছেলেমেয়েদের মদ্যেও না থাকে। প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে মেনে নিয়ে চলতে দিলে এই সমস্যা অনেক কম হয়। যদি কোন কারণে শিশুর মধ্যে বিদ্বেষ মনোভাব চাপা থাকে তাহলে আরো ক্ষতি। তাই বিদ্বেষ মনোভাবের কারণ জেনে বাবা-মা'কে সাবধান হতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ কিংা দাবরানি দিয়ে হিংসুটে সন্তানদের এই রোগ সারানো যাবে না, এর জন্য চাই শিশুর নিকট সহজব্যাপী আর সন্তানদের ভরসার পাত্র-পাত্রী হতে হবে বাবা-মাকে।

8) অপরাধ প্রবনতা : শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর একটি হল অপরাধ প্রবণতা। কাকে বলা যাবে অপরাধ প্রবণতা? সমাজ-বিরুদ্ধ আরচণকেই বলা যেতে পারে অপরাধ প্রবণতা (Delin quency may be defined as anti-social behaviour. এখন প্রশ্ন হল ভবিষ্যতে কোন ধরনের শিশুর অপরাধী হয়? এর উত্তর আজকের অপরাধ বিজ্ঞানীরাও দিতে পারেন নি। তথাপি অপরাধ প্রবণতার পেছনে কতকগুলি কারণকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মনে করা হয় বাবা-মা না থাকলে, বাবা-মা থাকলেও যদি ভীষণ কঠোর বা নিষ্ঠুর হন, যদি সন্তান পরিবারে ভীষণভাবে অবহেলিত হয়, শিশু অপসংগতি সম্পন্ন হলে, মানসিক অসুস্থতা, প্রায়বিক বৈকল্য বা জটিলতা, শিশু প্রচণ্ড উদ্বেগ, ঘৃণা ও নিরাপত্তার স্বীকার হলে অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি হতে পারে। এতসব কারণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হল মায়ের ব্যক্তিত্বের আর মেজাজের প্রকৃতি।

শিশু যাতে অপরাধপ্রবণ না হয়ে ওঠে অথবা অপরাধপ্রবণতার বৃদ্ধি না ঘটে বা তার সংশোধন এই

জন্য মা-বাবা শিশুকে স্নেহ করুন, নিজেদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের স্বাভাবিকতা বজায় রাখুন, পারিবারিক পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ এবং শৃঙ্খলা পরায়ন করে তুলুন। পরিবারের মধ্যে একাধিক শিশু থাকলে প্রতিটি শিশুই যেন সমান ভালবাসা পায়। পরিবারের বিভিন্ন শিশুর মধ্যে তুলনা করা উচিত নয়, শিশুকে অহেতুক মাত্রাতিরিক্ত তিরষ্কারও ঠিক নয়।

9) শিশুকে প্রশ্নকরণের কৌশল : শিশুর ভাষাবিকাশের সাথে সাথে শিশুর সঙ্গে পরিবারের বাবা-মা ও অন্যান্যদের যোগাযোগের সুযোগ বেড়ে যায়। এর ফলে বাড়ীর পরিবেশ ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের প্রশ্ন যেমন শিশুরা তাদের অভিভাবকদের করে তেমনি অভিভাবকরাও নানা প্রশ্ন করেন এই শিশুদের। কিন্তু শিশুদের প্রশ্ন করার ভাষা কেমন হবে, প্রশ্ন করার কৌশলই কেমন হবে? এটা ঠিক যে, শিশুর ভাষা বিকাশ অনেকটা হলেও ধারণা গঠনের বিস্তৃতি তখনও তেমন ঘটে না। তাই তাদের কাছে এমন প্রশ্ন করা যাবে না যার উত্তর দিতে শিশুদের ভাষাগত ব্যাঘাত ঘটে। আবার রুক্ষ বা রূঢ় ধরনের প্রশ্ন শিশুদের মনে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য এমনভাবে প্রশ্ন করতে হবে যাতে শিশু স্বচ্ছন্দে, তার ক্ষমতা অনুযায়ী ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, নতুবা সে অস্পষ্ট উত্তরে দেবে অথবা মিথ্যা কথা বলবে। বিপরীত ভাবে বাবা-মায়ের প্রশ্ন করার কৌশল সহজ স্বচ্ছন্দ হলে শিশুর উত্তর দেওয়া যেমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়, তেমনি প্রশ্ন থেকে উৎসারিত উদ্দীপনা শিশুর কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলতে পারে। এই প্রসঙ্গে বাবা-মায়ের মনে রাখা দরকার প্রশ্নের বাক্য হবে সংক্ষিপ্ত, সহজ ও সরল ও বাস্তব অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক।

10) জ্ঞানের বিকাশক্রম ও প্রথাগত শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি : এই বিশ্বসংসারে নিজের অস্তিত্ব সুরক্ষিত করে তোলাই মানবশিশুর মূল লক্ষ্য। এই অস্তিত্ব সুরক্ষার প্রশ্নেই মানবশিশুকে এই বিশ্বপ্রকৃতির সমগ্র বস্তু জগৎ এবং সমাজ পরিবেশের ঘটনার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চলে। সুতরাং অভিযোজন বা খাঁপ-খাইয়ে নেওয়ার জন্য শিশুকে পরিচিত হতে হয়, ধারণা গঠন করতে হয় এই বস্তু জগৎ আর সমান পরিবেশে বিভিন্ন ঘটনার সম্পর্কে। কীভাবে সেই কার্যসম্পন্ন হয়? জন্মের পর থেকে বস্তুজগৎ সম্পর্কে প্রত্যক্ষণই তার ধারণা গঠনে সহায়তা করে। বস্তুজগৎ সম্পর্কে এই ধারণা গঠন তথা প্রত্যক্ষনের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয় সংবেদন। মানবশিশু তার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে পঞ্চ অনুভূতি— দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ, যা লাভ করে তা-ই শেষ পর্যন্ত তাকে বস্তুজগতের সঙ্গে আচরণে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং ইন্দ্রিয় অনুশীলন বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজের চর্চা এবং উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। এর থেকেই ঘটে শিশুর জ্ঞানের উন্মেষ সাধনের ধারা। ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনের জন্যই দরকার বাবা-মা'র একান্ত সান্নিধ্য, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে শিশুর পরিচিত। পরিবেশকে কেন্দ্র করে শিশুর কৌতুহলকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। বরং শিশুর কৌতুহলকে পরিতৃপ্ত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বস্তুজগতের এই ধারণা লাভের সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হতে থাকে পরিবেশে বিভিন্ন ঘটনার কার্য-কারণ-বিশ্লেষণের সম্পর্ক স্থাপন এবং বিশ্বজগতের সমগ্রভাব সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। এই ভাব সত্তার সঙ্গে শিশু নিজেকেও সংযোজিত করে চলতে থাকে সামগ্রিক সমন্বয়ের কাজ। এই সমগ্র কাজের ধারাটির চল শিশু পবিারের সদসয্যদেরসঙ্গে তার প্রাথমিক পরিবেশেই। প্রথাহীনভাবে এই জ্ঞানলাভের ধরনই শিশুকে পরবর্তীকালে প্রথাগত শিক্ষার পথে অগ্রসর করে। জ্ঞানের বিকাশ ক্রমে পরিবারের বা বাবা-মায়ের সীমা বদ্ধতা কাটিয়ে শিশুকে ছুটতে হয় বিশেষজ্ঞ বা শিক্ষকের নিকট কোন বিদ্যানিকেতনে। সূচনা হয় শিশুর প্রথাগত শিক্ষার। জ্ঞানের বিকাশের ধারা সংযুক্ত হয় আর এক নতুন পরিবেশে। পুরাতন পরিবেশের সঙ্গে নতুন পরিবেশের তখন প্রয়োজন হয় সমন্বয়ের। এই সমন্বয়ের কাজে পিতামাতার ভূমিকা অনেকখানি।

বিদ্যালয় আর গৃহের এই শিক্ষাদানের দায়িত্বকে দেখা যায় তাহলে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা যায়—

১) কোল্ড, নীরব-জীবন। শিশু তার অনুভূতি দিয়ে শুধু উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে যখন।

২) মানসিক ক্রিয়ার উন্মেষ সাধন। শিশু তার মন বা চেতনা দিয়ে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ করবে যখন।

৩) শারীরিক ক্রিয়ায় প্রকাশ ঘটানো। মন বা চেতনার সমস্ত ভাবশক্তির বাহ্যিক প্রকাশ ঘটাবে বাস্তব কোন কর্ম প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে।

এই তিন ধরনের কার্য প্রণালীই মানুষের জীবনের সম্মিলিত ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং একদিকে অখণ্ড বিশ্বসত্তার সঙ্গে সমন্বয় সাধন অন্যদিকে প্রথাগত শিক্ষার প্রস্তুতি— এইভাবে ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্যে শিশু এগিয়ে তার পিতামাতা ও পরিবারের হাত ধরেই।

11) বাবা-মা'র সহনশীলতা : শিশু স্বভাব চঞ্চল। তার আচরণের এই চাঞ্চল্যকে, কোন কোন সময় অবাধ্যতাকে (বড়দের দৃষ্টিভঙ্গিতে) বাবা-মা'কে মেনে নিতে হবে, সহ্য করতে হবে। গায়ের জোরে বল প্রয়োগে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা ঠিক হবে না। পেশী শক্তিতে শিশুরা কমজোরি হলেও মানসিক শক্তি অনেক সময়েই বড়দের তারা হার মানায়। আধুনিককালে মনোবিদরা (যেমন— জঁযা পিঁয়াজে) শিশুকে তাঁর মত করে বড় হতে দেওয়াকে সমর্থন করেছেন। শিশু ঈশ্বর এর সন্তান আমাদের সনাতন বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়ে তার উপর বাবা-মা'র কর্তৃত্বকে চাপিয়ে না দেওয়াটাই উচিত। প্রকৃতিবাদী দার্শনিক রুশোর মতকে যতখানি সম্ভব শিশুকে তার প্রকৃতি বা স্বভাব অনুযায়ী বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়াটাই বাবা-মা'র উচিত কাজ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বাবা-মা সহনশীলতার নীতি এগিয়ে এলেই শিশুর মঙ্গল। সন্তানের মর্যাদা বাবা-মা'র হাতেই। বাবা-মা'কে সেই কাজটি পালন করতেই হবে অত্যন্ত সহনশীলতার সঙ্গেই।

12) শিশুকে সময় দেওয়া : দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততায়, জীবন জীবিকার বাস্তবতায় হয়তে সত্যিই বাবা-মা'র হাতে এমন সময় নেই যাতে তাঁদের শিশু সন্তান কিছুটা পেতে পারে। বাবা-মা'র শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এমন নয় যে, শিশু সন্তানের অতি অপরিণত জীবনের খেলাকে তাঁরা মেনে নিতে পারেন। তাঁদের রুচি, আগ্রহ, চিন্তা-চেতনা তাঁদের শিশু সন্তানের অনুসারী হয়তো একেবারেই উপযুক্ত নয়। তথাপি তাঁদের একটুখানি সময় বের করে, তাঁদের শরীর ও মনকে শিশুর মত করে, তাঁদের রুচি, আগ্রহ ও চিন্তাচেতনাকে শিশুসন্তানের খেলা অভিমুখী করতেই হবে। শিশুর খেলার উপকরণ হিসাবে শুধু মাত্র খেলনা কিনে দিলেই হবে না, প্রয়োজন তার খেলার সঙ্গী হিসাবে বাবা-মা'র নিজেদেরকেও সংযুক্ত করা। বাবা-মা'র জীবনের নমনীয়তায় তাঁদের নিজেদেরকে শিশুর পর্যায়ে উপস্থাপিত করতে হবে। বাবা-মা'র সঙ্গদান, তাঁদের অনুপ্রেরণা তাদের শিশুসন্তানকে উৎসাহিত করবে অনেকখানি। এতে লাভ তাদের শিশুসন্তানটির লাভ তাঁদের এবং সর্বোপরি পরিবার ও সমাজের। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাই বাবা-মায়ের তাদের শিশু সন্তানের জন্য একটুখানি সময় দিতেই হবে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় শিশুসন্তানের পরিচর্যায় বাবা-মা ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গুরুত্ব শিশুসন্তানের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মা-বাবাকে তাদের শিশুসন্তানের বিভিন্ন বয়সের বিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় সম্পূর্ণ বিনা প্রস্তুতিতে। এই কাজের জন্য মা-বাবার কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আগেকার দিনে যৌথ পরিবারের বৃদ্ধা-বৃদ্ধরা তাঁদের অভিজ্ঞতা পরিবারের নতুন মা-বাবাদের দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এইভাবে সন্তান-পালনের একটা ধারা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এখনো গ্রামাঞ্চলে এই ধারা কিছুটা বহমান। এতে সন্তান পালনের অনেক সমস্যার সুরাহা হয়। কিন্তু সমাজের একটি বড় অংশে এই সমস্যা

প্রকট। যেখানে নিউক্লিয়ার বা একক পরিবারের ছড়াছড়ি সেখানে এই সমস্যা মারাত্মক। তথাপি এমন একটা জরুরী বিষয়ের জন্য কোন ব্যবস্থাই আজও প্রথাগত বা প্রথাযুক্তভাবে গড়ে ওঠেনি।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৪ (Check your progress-4)

আপনার উত্তর ..... (এক বিষয় লিখতে হবে) .....

ক) শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মায়ের কর্তব্য কি?

খ) শিশুকে স্তন পান করানো প্রয়োজন কেন?

গ) মা-কে কেন সহনশীল হওয়া উচিত?

৬.৪ শিশুর জীবন বিকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব

বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রথাগত শিক্ষা শুরু হত প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। সেক্ষেত্রে শিক্ষালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে শিশু শিক্ষার্থী তার প্রথাগত শিক্ষা শুরু করতো। প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা বলে তেমন কোন চল ছিল না। কিন্তু বর্তমানে শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ স্থানে গড়ে উঠেছে প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেখানে আড়াই থেকে তিন বছর বয়সেই শিশুদের পাঠানো হয়। যে দায়িত্ব আগে পালন করতো পরিবারগুলি, সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছে নার্সারি বিদ্যালয়গুলি। গ্রামাঞ্চলেও এই প্রবণতা অল্পবিস্তর দেখা যাচ্ছে। শিশুদের এই বয়সটি হল অত্যন্ত স্পর্শকাতর, মানসিক ও প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য গঠনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং শিশুর ব্যক্তিত্ব ও সুস্থ মানসিক গঠনের জন্য এই সমস্ত প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব কতখানি তা সহজেই অনুমান করা যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকার একটা সহানুভূতিসূচক কথা ও ব্যবহারে যেমন একটি শিশুর জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে, জীবন বিকাশের সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে, জীবনের ভালো দিকগুলির প্রতি অভিমুখী হতে পারে, ঠিক তেমনি অসঙ্গত আচরণ ও নেতিবাচক ব্যবহারে শিক্ষক-শিক্ষিকা একটি শিশুর জীবনের অভিমুখকে বিভীষিকাময় করে তুলতে পারে তারও দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য যে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা যেমন অপ্রতুল তেমনি ত্রুটিহীন যথোপযুক্ত নয়। এই ধরনের প্রশিক্ষনে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুদের প্রকৃতি, সমস্যা, সমস্যা

সমাধানের উপায় পান না তেমন কোন অভিজ্ঞতা পান না। অথচ এই সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতেই গড়ে উঠছে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব কতখানি এবং কিরূপ তা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

১) শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন : শিক্ষিক-শিক্ষিকাদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি সহজ সম্পর্ক স্থাপন। এই ধরনের সংবেদনশীল, সৃজনাত্মক কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সর্বাগ্রে তৃপ্ত থাকতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা হলেন শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় পিতা/মাতা, তার মুক্তিদাতা/মুক্তিদাত্রী। শিশুর জীবনে বিদ্যালয় হল দ্বিতীয় গৃহ। এই গৃহের গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যালয়ের পরিবেশ যেন গৃহের পরিবেশকেই মনে করিয়ে দেয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কার্যত শিশুর বাবা-মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

২) শিক্ষার্থীর প্রতি মর্যাদা দান : প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্রমেই যে বড় হচ্ছে, অনেক সময় এই বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে থাকে না। তাই অনেক সময়ে অন্যান্য সহপাঠিদের সামনেই কোন কোন শিক্ষার্থীর প্রতি মর্যাদা হানিকর কথা প্রয়োগ করা হয়, নানাভাবে অসম্মান করা হয়, শ্রেণিকক্ষে অপমান করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই ধরনের আচরণ ঠিক নয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই ধরনের আচরণ ঠিক নয়। এই ধরনের আচরণে যেমন শিশুর অত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়, তেমনি হীনমন্যতার জন্ম দেয়। সেইজন্য একটু বড় হলে শিশুর প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের।

৩) অতিরিক্ত চাপ তেকে শিশুকে মুক্ত রাখা : আড়াই থেকে তিন বছরের শিশুদের শহরাঞ্চলের নার্সারিতে বা প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠিয়ে বাবা-মা'রা অনেক সময় চাপের মধ্যে ফেলে দেন। আনন্দপূর্ণ পরিবেশে, হাসি-হৈ-হুল্লোর নিয়ে শিশুকে সময় কাটানোর সময় না দিয়ে বই-খাতার বোঝা, বিষয়বস্তুর বোঝা, অভিজ্ঞতা অর্জনের নামে কার্যত প্রচণ্ড চাপের মধ্যেই সময় কাটাতে হয় শিশু শিক্ষার্থীকে। এই ধরনের চাপ থেকে শিশু মুক্ত রেখে একটা আনন্দপূর্ণ পরিবেশে শিশুকে শিশুর মতোই অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। অনেক সময় শিশুর উপর অতিরিক্ত চান শিশুকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সবসময় সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

৪) অংশীভূত-বোধ (sense of belongingness) জাগরণ : মানুষের আত্মবিশ্বাসের একটা বড় কারণ হল একাত্মবোধ (sense of belongingness)। নিজেকে কোন কিছুর অংশ হিসাবে মনে করার মধ্যে দিয়ে এই ধরনের বোধ গড়ে ওঠে। শিশু প্রথম তার বিদ্যালয়কে গৃহের মতোই আপন করে ভাবতে শেখে, সে অনুভব করে এবং গর্ববোধ করে তার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসাবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে করে বাবা-মায়ের প্রতিভূ, সহপাঠিদের মনে করে তার ভাই-বোন বা পরিবারের সদস্য হিসাবে। শৈশবে সে জেনেছে তার বাবা মার, পরে জেনেছে সে পরিবারের তারও পরে সে অনুভভ করেছে সে কোন বিদ্যালয়ের। এইভাবে ধীরে ধীরে একাত্মবোধের জাগরণের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা অনেকখানি। শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যবহার, আচার-আচরণ, ভালবাসা, সহানুভূতি, মমত্ববোধ শিষ্যর এই একাত্মতাবোধ গঠনে সাহায্য করে। কিন্তু এই সময় শিশু যদি বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভালোবাসা, সহানুভূতি ইত্যাদি না পায় তাহলে শিশুর মধ্যে একাত্মতাবোধের পরিবর্তে ভয়, উদ্বেগ, বিরক্তি, বিচ্ছিন্নতাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

৫) শিশুর মধ্যে সু-অভ্যাস গঠন : শিশুর জীবনের প্রথমদিক অর্থাৎ তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের অভিজ্ঞতাই শিশুকে প্রভাবিত করে বেশি। গভীরভাবে রেখা পাত করে শিশুর মনে। এই সময় যে সমস্ত অভ্যাসমূলক কার্য শিক্ষক শিক্ষিকারা শিশুদের রপ্ত করতে দেন

সেগুলিই ধীরে ধীরে সু-অভ্যাস গঠনের ভিত্তি তৈরি করে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, ব্যবহার, সাধারণ কাজকর্ম শিশুদের প্রভাবিত করার মধ্য দিয়েই সু-অভ্যাসগুলি গড়ে উঠতে থাকে। এই ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই কিছুটা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। সু-অভ্যাস গড়ে তোলার এটাই উপযুক্ত সময়।

৬) শৈশবের দৈহিক বিকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকা : শৈশবে শিশুর বিকাশের হার থাকে খুব বেশি। জন্মের পর থেকে পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তিন থেকে পাঁচ বা ছয় বছর বয়স পর্যন্ত সময়কাল প্রান্তীয় শৈশব নামে পরিচিত। এই স্তরটি মূলত প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান করে শিশুশিক্ষার্থী। এই সময়কালে শিশু দেহ সঞ্চালনমূলক খেলাধূলা করে এবং এর ফলশ্রুতিতে তার দেহের গঠন বেশ মজবুত হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন লক্ষ্য করা যায়। দৈহিক বিকাশের ফলে যে সব চাহিদা শিশুর মধ্যে দেখা যায় তার মধ্যে সক্রিয়তার চাহিদা ও পুনরাবৃত্তির চাহিদা প্রবল। স্বাভাবিকভাবেই খেলা ও হাতের কাজের প্রসঙ্গটি শিশুদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খেলাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে খেলাভিত্তিক শিক্ষা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব আছে। সেগুলি হল :

(i) শিক্ষণীয় বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী নির্বাচিত করতে হবে।

(ii) খেলার বিষয় বা পাঠ্যক্রমটিকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে খেলাভিত্তিক অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীর বহুমুখী চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাবে তেমনি অন্যদিকে শিক্ষনীয় বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্ককে ঘনিষ্ট করে তুলবে।

(iii) খেলা ভিত্তিক অভিজ্ঞতাগুলিকে 'সহজ থেকে কঠিন' এই নীতিতে বিন্যাস্ত করতে হবে।

(iv) বিদ্যালয় পরিবেশকে এমনভাবে সংগঠিত করা দরকার যাতে শিশু শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে ক্রীড়াধর্মী শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

(v) খেলা পরিচালনা এবং খেলা ভিত্তিক শিক্ষা চলাকালে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি প্রদর্শন, পারস্পরিক মত বিনিময়, স্নেহ-ভালবাসা সম্পর্ক স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(vi) শিক্ষার্থীকে স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে এবং অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।

৭) শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ ও চাহিদা পূরণে শিক্ষক-শিক্ষিকা : শিশুর বয়স যতই আড়াই থেকে তিন এবং তার বেশি হতে থাকে ততই সে বাইরের বস্তুজগৎ সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে সক্ষম হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে শিশু তার অর্থপূর্ণ ধারণা গঠন করতে পারে। সেক্ষেত্রে তার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের বিকাশ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। জ্ঞানোন্দ্রিয়ের চর্চা যেমন বস্তুজগৎকে প্রত্যক্ষ করে ধারণা গঠনে সহায়তা করে তেমনি এই স্তরে শিশুর প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটতে থাকে। শিশুর এই প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে তার অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সমান্তরালভাবে। প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির বিকাশ ঘটে প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ, স্মৃতি প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে, যেগুলিকে একত্রে বলা হয় প্রজ্ঞামূলক প্রক্রিয়া (cognitive process)। বাইরের পরিবেশের যে জগৎ তাকে জানার এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধির যে ক্রমিক পরিণতির প্রক্রিয়াই হল প্রজ্ঞামূলক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ধারাকে বলা হয় প্রজ্ঞামূলক বিকাশ। প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানী জ্যাঁ পিয়াজেঁ। তিনি মনে করেন শিশুর প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে চারটি স্তরে মাধ্যমে—

(i) সংবেদন সঞ্চালন স্তর (জন্ম থেকে ২ বছর)
(ii) প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর (২ থেকে ৭ বছর)
(iii) মূর্ত সক্রিয়তার স্তর(৭ থেকে ১১ বছর)
(iv) যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর (১১ থেকে কৈশোরের শেষ পর্যন্ত)

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে শিশুর প্রাক্ সক্রিয়তার স্তরটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কারণ এই বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিশুরা আসে তাদের বয়স সাধারণত ২ থেকে ৬-এর মধ্যে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার দায়িত্ব অনেকখানি। প্রাক্-সক্রিয়তা স্তরের শিশুদের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—

ক) নিজের কল্পনার জগতের বাইরে বাস্তবজগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি ঘটে।
খ) প্রথমদিকে সর্বপ্রাণবাদ সক্রিয় হলেও শিশু ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে— জড় জগৎ, জীব জগৎ, সজীব প্রাণী এবং জীবিত প্রাণীদের চেতনার অস্তিত্ব।
গ) অহংবোধের চিন্তায় শিশু বিভোর থাকে (ego centric)।
ঘ) বিপরীতধর্মী চিন্তনে সে অক্ষম থাকে (reverse thinking)।

প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুরে এই বৈশিষ্ট্যগুলি খেয়াল রেখে শিশুর শিক্ষনে কাজে লাগাতে পারেন। যেমন—

(i) শিশুরা বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচরণকে অনুকরণ করতে পারে
(ii) খেলার সময় বিভিন্ন ধরনের সত্যিকারের আচরণের ভান করতে পারে।
(iii) শিশুরা তাদের চিন্তনের প্রতিফলন ঘটাতে পারে ছবি আঁকার মাধ্যমে।
(iv) শিশুদের চিন্তার বাহন হিসাবে কাজ করে ভাষা। এজন্য ভাষার বহুল ব্যবহার ঘটে।

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের এই সমস্ত স্বাভাবিক প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে পরবর্তী স্তরের দরকারী দিকগুলির কথা চিন্তা করে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

৮) শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক বিকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকা : ভয়, ক্রোধ, আনন্দ, দুঃখ, ঈর্ষা প্রভৃতিকে এক কথায় বলা হয় আবেগ বা প্রক্ষোভ। মানবজীবনের একটি অতি প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। আবেগ বা প্রক্ষোভের অভিজ্ঞতা প্রতিটি মানুষের থাকে। এক একটি প্রক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে এক এক রকমের অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তাদের বহিঃপ্রকাশের বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন ভিন্ন রকম। প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন— প্রজ্ঞামূলক উপাদান, অনুভবমূলক উপাদান এবং সঞ্চালনমূলক উপাদান। শিশুদের প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে এই তিনপ্রকার উপাদান বড়দের থেকে আলাদা। প্রকৃতপক্ষে শিশু যতই তার পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে ততই তার উপাদানগুলির পবির্তন হতে থাকে। প্রক্ষোভের উপাদানগুলির সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের এই ধারাই হল প্রক্ষোভমূলক বিকাশের মূল কথা।

প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মধ্যে সাধারণভাবে যে সমস্ত প্রক্ষোভগুলি দেখা যায়, সেগুলি হল— ভয়, রাগ, আনন্দ, দুঃখ, ঈর্ষা, কৌতুহল, হিংসা, স্নেহ প্রভৃতি। এই স্তরের শিশুদের প্রক্ষোভের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে—

(i) শিশুদের প্রক্ষোভের তীব্রতা খুব বেশি। নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা খুব কম।
(ii) শিশুদের প্রক্ষোভমূলক অবস্থার স্থায়িত্বকাল খুব কম। সহজেই নিরসন ঘটে।
(iii) শিশুদের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া খুব বেশি পরিবর্তনশীল। কোন একটি মুহূর্তে শিশু ভীষণ রাগাান্তি আবার পরমুহূর্তেই দেখা যায় আনন্দের আতিশয্য।

(iv) শিশুদের প্রায় সফল আচরণ প্রক্ষোভধর্মী বা প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রিত।

(v) অভিজ্ঞতালাভ বা শিক্ষার প্রভাবে প্রক্ষোভগুলি নিয়ন্ত্রণ যোগ্য।

শিশুদের প্রক্ষোভমূলক উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে খেয়াল রেখে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকখানি দায়িত্ব বর্তমান। শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভগুলির ভূমিকা যথেষ্ট।

একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা যিনি শিশুর চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল। এবং শিশুর প্রক্ষোভ অনুযায়ী তাকে স্নেহশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন তিনি সহজেই তাকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করতে সক্ষম; তার অস্বাস্থ্যকর প্রক্ষোভগুলিকে স্বাস্থ্যকর প্রক্ষোভে রূপান্তরিত করে শিশুকে তার গঠনমূলক জীবনের দিকে পরিচালিত করতে পারবেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং স্নেহশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে তিনি সহজেই শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষন কার্যে সাফল্য লাভ করতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান বা অভিজ্ঞতার প্রদানের আগে শিশুদের সাথে একটি মানসিক সংযোগ সাধন দরকার। সেক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকা তার সহৃদয় ব্যক্তিত্ব, সংবেদনশীল মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশকে যথার্থ জ্ঞানলাভের উপযোগী করে তুলতে সক্ষম হন।

খেলাধূলার মাধ্যমে, গল্পের মাধ্যমে, নাচ-গান, নাটকের মাধ্যমে, ভ্রমণ এবং বিভিন্ন প্রকার সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা সহজেই শিশুদের আপন করে নিয়ে তাদের প্রক্ষোভগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার মধ্য দিয়ে শিশুদের নিজেদের প্রক্ষোভমূলক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখাতে বা অভিজ্ঞতা প্রদানে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

শিক্ষক/শিক্ষিকার মনে রাখা দরকার যে, উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষার মতো নেতিবাচক প্রক্ষোভগুলি শিশুকে নেতিবাক দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি করে শিশুর জীবনে বিকাশে বিরূপ প্রভাব ফেলে। অসুখী শিক্ষার্থী কখনো শিখনে সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

শিশুর প্রক্ষোভিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিশুর নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাস। বন্ধুত্বপূর্ণ স্নেহশীল পরিবেশ শিশুকে যেমন নিরাপত্তা দেয় তেমনি তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ঘটায়। এর ফলে শিশুর প্রক্ষোভিক বিকাশের ধারা সুনিয়ন্ত্রিত পথে চালিত হতে পারে। এক কথায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি জোর দেবেন—

(i) শিশুকে যথাযথ নিরাপত্তা দান,

(ii) প্রক্ষোভজনিত উদ্বেগকে হ্রাস করে, তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো,

(iii) শ্রেণিকক্ষে স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টি করা,

(iv) শিক্ষার্থীর অনুভূতিকে গ্রহণ, সজনশীল হওয়া, শ্রদ্ধা করা।

৯) শিশুর সামাজিক বিকাশে শিক্ষক/শিক্ষিকার দায়িত্ব : 'সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারণায় শিশু' এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম মানুষের যেমন একটি জৈবিক সত্তা আছে, তেমনি আছে তার সামাজিক সভা। কিন্তু তার সামাজিক সত্তা শেষ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক সত্তায় পরিণতি লাভ করে। এই ধরনের সাংস্কৃতিক সত্তা মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্তার বিকাশে শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা ও দায়িত্ব কতখানি। এই দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনার আগে শিশুর এই ধরনের বিকাশের বৈশিষ্ট্যটি জানা দরকার একটুখানি।

মনোবিজ্ঞানী এরিকসনের মনো সামাজিক বিকাশের ধারণা থেকে আমরা জানতে পারি যে, জন্মের সময় প্রথম থেকেই অহম (Ego) এবং অদস (Id) এই দু'টি স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। অহম (Ego) স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে প্রথম থেকেই থাকে সক্রিয়। স্বাধীন সত্তা হওয়ার ফলে অহম দ্বন্দ্ব মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিকাশ অগ্রসর হওয়ার দরুণ অহমের স্বকীয়তা

এবং সমাজ পরিবেশের পরিস্থিতি এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ক্রমশ সমাজ পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির নিরন্তর অভিযোজন এর মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটতে থাকে। ব্যক্তি ও সমাজের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের ধারা অগ্রসর হতে থাকে এবং সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং অভিযোজন প্রক্রিয়ার উপর অহমের বিকাশ নির্ভরশীল। অহং সত্তার বিকাশের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ঘটে থাকে।

এরিকসনের মতে মনোসামাজিক দ্বন্দ্ব এবং অহমের বিকাশ ঘটে কয়েকটি পর্যায়ে। এই পর্যায়গুলির সংখ্যা হল চার। প্রতিটি পর্যায় আবার কয়েকটি উপস্তরে বিভক্ত। এরিকসন মোট আটটি স্তরের কথা বলেছেন—

প্রথম স্তর : জন্ম—১ বছর
দ্বিতীয় স্তর : ১ থেকে ৩ বছর
তৃতীয় স্তর : ৩ থেকে ৬ বছর
চতুর্থ স্তর : ৬ থেকে ১২ বছর
পঞ্চম স্তর : ১২ থেকে ১৮ বছর
ষষ্ঠ স্তর : ১৮ থেকে ২০ বছর
সপ্তম স্তর : ২০ থেকে ৫০ বছর
অষ্টম স্তর : ৫০-এর উর্দ্ধে

উপরোক্ত স্তরগুলির মধ্যে মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরটি প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে শিশুর মধ্যে যে সমস্ত সামাজিক আচরণগুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলির ভিত্তিতেই প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া দরকার।

শিশুর জীবনের প্রথম স্তর গৃহ পরিবেশে বাবা-মা'র কাছে শুরু হয়েছিল আস্থা ও অনাস্থার দ্বন্দ্ব নিয়ে। বাবা-মা'র প্রতি আস্থা সৃষ্টি হলে শিশুরা স্বাভাবিক সক্রিয়তার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা পেতে চায় তাদের দ্বিতীয় করে। সাবধানতার সঙ্গে শিশুকে যদি স্বাধীনতা ভোগ করতে দেওয়া হয় তবে তার মধ্যে আত্মনির্ভরতা জন্মায়। বিদ্যালয়ে যদি শিশুর আত্মসক্রিয়তা বাধা দেওয়া হয় তবে তার মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা কমে গিয়ে নিজের প্রতি সন্দেহ জাগে এবং অনেক কাজেই ব্যর্থ হতে হয়। ব্যর্থতার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলে তার মধ্যে লজ্জার প্রকাশ ঘটে। একেই বলা হয় স্বাধীনতা বনাম লজ্জা ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব।

তৃতীয় স্তরে শিশু তার স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা, ভাষা বিকাশের ফলে নিজে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা কাজে উদ্যোগ নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে চায়। বস্তু জগৎকে জানতে চায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি স্বাধীনতা প্রবন শিশুকে তার সব উদ্যোগে বাধা না দেন তবে শিশু আরও কৌতুহলী ও অনুসন্ধিৎসু ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরিবর্তে শিশুর উদ্যোগের ক্ষেত্রটিকে অনুৎসাহিত বা সঙ্কুচিত করে দিলে সেভাবে তার কাজ সঠিক হচ্ছে না, সে ভাবে যে অন্যায় কাজ করছে। তার মধ্যে একটা অপরাধবোধ জন্মায়। একেই বলা হয় উদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ।

শিক্ষার কাজ যেহেতু শিশুর ব্যক্তির বিকাশে সহায়তা করা সুতরাং সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে শিশুর লজ্জা ও সন্দেহের দূর করে স্বাধীন সত্তাকে বিকশিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আবার কর্মচঞ্চল শিশুর সক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য, শিশুর অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে বিভিন্ন কাজের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে পারার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য শিশুকে সব সময় উৎসাহিত করা, অনুপ্রেরণা

দান করে কর্মউদ্যোগী শিশুতে পরিণত করা শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব। শৈশবেই শিশু যদি হীনমন্যতার শিকার হয়, লজ্জা আর সন্দেহ প্রবন হয়, আত্মনির্ভরতা যদি কম হয় তাহলে তার ব্যক্তিত্ববিকাশ যেমন ব্যাহত হয় তেমনি সামাজিকীকরণও ব্যাহত হয়। সেই ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হবেন।

শিশু শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি আচরণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল আচরণগুলি সামাজিক আচরণ নামে পরিচিত। সাধারণত পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত যে সব প্রধান প্রধান সামাজিক আচরণ লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল— অনুকরণ, রেষারেষি, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সামাজিক স্বীকৃতি, ভাগাভাগি করা এবং সান্নিধ্যমূলক আচরণ।

এই সমস্ত সামাজিক আচরণগুলির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে কতকগুলি অসামাজিক আচরণও লক্ষ্য করা যায়, যেমন— বড়দের সমস্ত কতৃত্বের বিরোধিতা করার প্রবনতা, আক্রমনাত্মক ক্রুদ্ধ আচরণ, ছোটদের উপর খবরদারি করা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ধ্বংসাত্মক আচরণের প্রবনতা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব হল এই সময় শিশুদের সামাজিক আচরণগুলিকে ক্রমশ দৃঢ় করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা এবং অসামাজিক আচরণগুলিকে মার্জিত হতে সাহায্য করা। এর ফলশ্রুতিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সামাজিক বিকাশের ধারা স্বাভাবিকভাবে সমাজ স্বীকৃত পথে অগ্রসর হতে পারে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-৫ (Check your progress-5)

নির্দেশ . . . . . (এক বিষয়) . . . . . .

ক) অতিরিক্ত চাপে থেকে শিশুকে মুক্ত রাখার উপায় কি?

খ) শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক বিকাশের প্রয়োজন কেন?

গ) শিশুর সামাজিক বিকাশে শিক্ষকের দুইটি দায়িত্ব লেখ।

৬.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর পিতা-মাতার দায়িত্বকে বৃহত্তর ভাবে দু'ভাবে ভাগ করা হয়

ক) শিশুর শারীরিক বিকাশ, যত্ন ও পরিচর্যা;

খ) শিশুর মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশে সাহায্য করা।

মায়ের গর্ভ অবস্থা থেকেই বিভিন্ন ক্ষেএত্র মায়ের যত্ন এবং পরিচর্যা করা দরকার। কারণ মায়ের পুষ্টি, সুস্থ শরীর, স্বাভাবিক মন গর্ভের শিশুকেও একইভাবে সাহায্য করে।

এছাড়া শিশুর স্বভাবকে বোঝা, শিশুকে প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদান, শিশুদের মধ্যে সত্য ও মিথ্যাচারের কুফল শেখানো, শিশুর আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। শিশুর জীবন বিকাশে শিক্ষক শিক্ষিকাদের দায়িত্বও কম নয়। এই দায়িত্ব প্রাক প্রাথমিক স্তরে আরো বেশী। এই স্তরে শিক্ষক/শিক্ষার্থী শিশুদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবেন, শিক্ষার্থীকে মর্যাদা দেবার চেষ্টা করবেন, অতিরিক্ত চাপ থেকে শিশুকে মুক্ত রাখবেন, অনুভূতি বোধ জাগাতে চেষ্টা করবেন, সু-অভ্যাস গঠনের চেষ্টা করবেন ইত্যাদি। শিশু শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ ঘটানোও এই সময় শিক্ষক/শিক্ষার্থীর গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেই পরে।

৬.৬ অনুশীলনী (Exercise)

ক) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) গর্ভবতী মায়ের কোন ভাবেই নেশা করা উচিত নয় কেন?

(ii) দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর খেলার সাথী কারা?

(iii) শিক্ষক/শিক্ষিকা কিভাবে শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবেন?

(iv) পিয়াজেঁর মত অনুসারে শিশুর বিকাশের স্তরগুলি কি কি?

খ) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৩০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) শিশুর টীকাকরণ প্রয়োজন কেন?

(ii) শিশুকে প্রশ্ন করণের কৌশল গুরুত্বপূর্ণ কেন?

(iii) শিশুকে প্রাক্ষোভিক বিকাশে শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা লিখুন।

(iv) শিশুর সামাজিক বিকাশে কোন কোন আচরণ গুরুত্বপূর্ণ?

গ) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) শিশুর ভালবাসা প্রয়োজন কেন?

(ii) শিক্ষক কিভাবে শিশুর মধ্যে সু-অভ্যাস গঠন করবেন?

(iii) শৈশবে দৈহিক বিকাশে শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা লিখুন।

(iv) শিশুর সামাজিক বিকাশ বলতে কি বোঝায়?

৬.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত-৪ (Hints of answer to check your progress-4 and 5)

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৪

(ক) কোনভাবে অসুখে পড়বেন না, হাটা-চলা ইত্যাদিতে সতর্ক হওয়া, নেশাকারক দ্রব্য গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

(খ) মাতৃদুগ্ধে কোলাস্ট্রাম রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

(গ) পিতা-মাতার সহনশীলতা শিশুর বিকাশে সাহায্য করে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-এর উত্তর সংকেত-৫

(ক) আনন্দদায়ক পরিবেশ এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সহৃদয় ব্যবহার।

(খ) শিশুদের প্রক্ষোভ বড়দের থেকে আলাদা। প্রোক্ষভের সঠিক বিকাশ না হলে শিশুর মানসিক প্রকৃয়া ব্যহত হয়।

(গ) i. শিক্ষক শিশুর উদ্যোগকে উৎসাহিত করবেন। ii. শিশুর অনুসন্ধিতসা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন।

একক ৭ ❑ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্যশিক্ষা (Health Education at Pre-primary Level)

গঠন **(Structure)**

৭.১ ভূমিকা **(Introduction)**

৭.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৭.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষা কি? **(What is Health Education?)**

৭.৩.১ প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার গুরুত্ব **(Importance of Health Education at Pre-primary Schools)**

৭.৩.২ ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য বিধি **(Personal and Community health principles)**

৭.৩.৩ মানসিক স্বাস্থ্য **(Mental health)**

৭.৩.৪ সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি **(Community health and hygiene)**

৭.৪ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শন **(School health inspection)**

৭.৫ সারসংক্ষেপ **(Summary)**

৭.৬ অনুশীলনী **(Exercise)**

৭.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত **(Hints of answer to check your progress)**

৭.১ ভূমিকা (Introduction)

সুস্থ দেহ সুস্থ মনের আধার। শিশু শিক্ষার্থী যদি স্বাস্থ্যবান না হয়, তার মন যদি সতেজ ও সবল না হয় তবে তার পক্ষে যথার্থভাবে শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে শিশু ও তার পরিবেশের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ে শিশুর স্বাস্থ্য আর স্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিষয়। শিশু শিক্ষার্থীদের যদি সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন গড়ে তুলতে হয় তবে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অল্পবিস্তর আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলিতে স্বাস্থ্যশিক্ষা বা স্বাস্থ্যসচেতনতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা বা স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অভ্যাস গঠনের জন্য কোনো ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না অথচ স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে তত্ত্বগত বা বাস্তব অভিজ্ঞতা দান, আধুনিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ধারণা গঠন, স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ।

৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি শেষ করার পর আপনি—

- স্বাস্থ্য শিক্ষা কি জানতে পারবেন;
- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন;
- ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধি জানতে, বুঝতে এবং শিশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন;
- বিদ্যালয়, বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় পরিদর্শন-এর গুরুত্ব কি বুঝতে পারবেন।

৭.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষা কী? (What is Health Education?)

সাধারণভাবে স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তির দৈহিক সুস্থতাকে বোঝানো হলেও এটি কিন্তু সংকীর্ণ ধারণা। মানবশিশু জন্মগ্রহণের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার চারপাশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এই দুই প্রকার পরিবেশেরই বিভিন্ন উপাদান ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং পরিবেশ যদি সুস্থ থাকে তবে ব্যক্তির স্বাস্থ্যও সুস্থ হয়। ব্যক্তির দেশের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে নানা রকমের চেতনা আর আবেগ জড়িত। এজন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণা একটি ব্যাপক ধারণা। বর্তমানে বিশেষজ্ঞদের ধারণায়— "স্বাস্থ্য ব্যক্তির একটি সার্বিক অবস্থা, যে অবস্থায় ব্যক্তি তার বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ও শারীরিক সম্পকগুলিকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কর্মে সুষ্ঠভাবে এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়।" সুতরাং স্বাস্থ্যশিক্ষা বলতে শুধুমাত্র তত্ত্বগত জ্ঞানলাভের বিষয় নয়, এটি বাস্তব ব্যবহারিক অবস্থার শিক্ষাও বটে। আবার ব্যক্তি তার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক গুলিকে ব্যবহার করে থাকে সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সঙ্গে সমাজ বা সমষ্টিগত স্বাস্থ্যের বিষয়টি গভীরভাবে সম্পর্কিত।

ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক জীবনে কীভাবে সুস্থতার সঙ্গে শারীরিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক ক্ষমতাকে কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে পারে, সেই শিক্ষাই হল স্বাস্থ্যশিক্ষা। পুঁথিগত জ্ঞানার্জন এর সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নীরোগ ও সুস্থ দেহে আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহে অভ্যস্থ হওয়াই হল স্বাস্থ্যশিক্ষার মূলকথা।

অনেক সময় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Hygiene) এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা (Health Education) শব্দ দু'টি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তা সঠিক নয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হল এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, অথবা স্বাস্থ্যের অনুকূল অবস্থা রীতি-নীতি সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞান দেওয়া হয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকগুলি যে পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় তা-ই হল স্বাস্থ্যশিক্ষা। অর্থাৎ স্বাস্থ্যশিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষার রীতি-নীতিগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়।

৭.৩.১ প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার গুরুত্ব :

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা আসে তাদের বয়স সাধারণত আড়াই বছর থেকে ছয় বছর

পর্যন্ত হয়। এই বয়সের শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য তাদের জীবনের ভিত্তি। এইসব শিক্ষার্থীরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। এদের সুস্থতাই দেশের সামগ্রিক সুস্থতার প্রতীক। সুতরাং দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড এই সব শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। এইসব শিশু শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অর্থে মানবসম্পদে পরিণত করার প্রাথমিক দায়িত্ব যাদের তাদের স্বাস্থ্যশিক্ষার জ্ঞান থাকা দরকার তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক জীবন উভয় দিক থেকেই। সুতরাং প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়স যেহেতু আড়াই থেকে ছয় বছরের মধ্যে থাকে, তাই স্বাভাবিকভাবেই বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে কম। প্রতিনিয়ত তাদের রোগ জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এইসব রোগজীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের এমন কতকগুলি স্বাস্থ্যসংক্রান্ত রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়, যাতে স্বাস্থ্য রক্ষা অনেকটা সহজ হয়। দেহ-মনের স্বাভাবিক বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। এর সুফল তারা পায় তাদের দেহ, মনে, পরিবার ও বিদ্যালয় জীবনে। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার এই নিয়ম-কানুনগুলি সু-অভ্যাসের আকারে যদি বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা পায়, তবে তা তারা পারিবারিক জীবনেও কিছুটা কাজে লাগাতে পারে। বিদ্যালয়ের মূল শিক্ষা কার্যটিও সুসম্পন্ন হতে পারে। স্বাস্থ্যাভ্যাসের এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫৪-৫৬) কমিশন তার রিপোর্টে বলেছেন— "Every student in the school requires to be trained in sound health habits both at school and at home. The instruction should be practical so that he may not only apreciate the value of health education but also learn the ways in which he can effectively maintain and improve his health." সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হলে তার ভিত্তি রচনা করা দরকার প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের শুরুতেই।

শিক্ষার্থীর জীবনে তিনটি অস্তিত্ব বা সত্তা প্রধান। সেই তিনটি সত্তা হল তার দৈহিক বা শারীরিক সত্তা, মানসিক সত্তা আর সামাজিক সত্তা। ব্যক্তির দেহ, মন আর যে সমাজে সে বাস করছে, তার স্বাস্থ্য অটুট থাকলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক সত্তার সুরক্ষিত থাকে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি, সমাজ, সর্বোপরি সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য আনন্দময় সুস্থ অবস্থায় অবস্থান করতে পারে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য যদি হয় শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তবে অবশ্যই স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

৭.৩.২ ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি (Personal and social health principles) :

প্রতিটি ব্যক্তি যাতে নিজের দেহ সম্পর্কে সচেতন ও যত্নবান হয় এবং নিজের চেষ্টায় স্বাস্থ্য সম্পদকে সুরক্ষিত করতে পারে, তাকে বলা যায় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি। বি. এন. ঘোষের মতে "Personal hygiene deals with matters pertaining to the health of individual himself for the maintainance of which the responsibility lies with him alone." অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় স্বাস্থ্যবিধি নীতিগুলিকে ব্যবহারের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে যেখানে আলোচনা করা হয়, তাই হল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির প্রধান তিনটি দিক হল— (i) ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, (ii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং (iii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রচেষ্টা।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য :

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি হল :

(i) স্বাস্থ্য সচেতনতা : ব্যক্তিকে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই হল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির প্রধান উদ্দেশ্য। জীবনের যে কোন স্তরে ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, একটি হল বংশগতি, অন্যটি হল তার পরিবেশ। বংশগত বস্তু এবং পরিবেশগত অবস্থা ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। বংশগতিকে তেমনভাবে পরিবর্তিত করতে না পারলেও পরিবেশগত অবস্থাকে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় পরিবর্তিত করে নিজের অনুকূলে আনা সম্ভব। এর ফলে ব্যক্তি তার স্বাস্থ্যমান সম্পর্কেও সচেতন হতে পারে।

(ii) স্বাস্থ্যবিধিতে উৎসাহ প্রদান : স্বাস্থ্যবিধির বিভিন্ন দিকগুলি শিক্ষার্থী পরিচিত হতে পারলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞানগুলি সম্পর্কে সে ক্রমশ কৌতুহলী ও আগ্রহী হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থী ক্রমশ উন্নত স্বাস্থ্য ও জীবনযাপন উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

(iii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা : ব্যক্তির স্বাস্থ্য উন্নয়নের আগে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থানে অবনমনের সুযোগ না দিয়ে তাকে যথাযথভাবে রক্ষা করা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্ভব হলেই, পরবর্তী ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য উন্নয়নের কার্য আরো সহজ হয়।

(iv) অভিযোজনে সহায়তা করা : স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি শুধুমাত্র দৈহিক দিক থেকে অসুবিধা ভোগ করে না, মানসিক দিক থেকে অনেক সময় ভেঙে পড়ে, বা দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে তার যে হীনমন্যতাবোধ জন্মায়, তা তার সার্বিক অভিযোজনে ব্যাঘাত ঘটায়। তার জীবনবিকাশের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি তাকে এই অসুবিধা দূর করে স্বাস্থ্যরক্ষায় যেমন সহায়তা করে তেমনি তার হীনমন্যতাবোধ দূর করে সার্বিক অভিযোজনে সহায়তা করে।

ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির মূল নীতি :

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির মূলনীতিগুলি অভ্যাস কেন্দ্রিক। কতগুলি সু-অভ্যাস গঠনের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিকে সার্থক করে তোলা হয়। সেগুলি হল :

ক) স্বাস্থ রক্ষা ও খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত অভ্যাস :

১) খিদে পাওয়ার সময় সম্ভব হলে খাওয়া উচিত।

২) খাদ্যবস্তু নির্বাচিত হওয়া উচিত খিদে অনুযায়ী।

৩) ধীরে সুস্থে ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া দরকার।

৪) খাওয়ার সময় পড়াশোনা সংক্রান্ত কাজ না করাই উচিত।

খ) বিশ্রাম ও ঘুম সংক্রান্ত অভ্যাস :

১) ঘুমানোর নির্দিষ্ট সময় থাকা উচিত।

২) মশারি টাঙানোর পর পরিচ্ছন্ন বিছানায় ঘুমানো উচিত।

৩) ঘুমের পূর্বে কোন কঠিন সমস্যা নিয়ে চিন্তা না করা উচিত।

৪) রাত্রিতে খাওয়ার অন্ততঃ আধঘণ্টা পর ঘুমাতে যাওয়া উচিত।

গ) ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত অভ্যাস :

ত্বকের যত্ন — ১) প্রতিদিন পরিষ্কার ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করা দরকার

২) কোন কাজে ক্লান্ত হওয়ার পর হঠাৎ করে স্নান করা উচিত নয়।
৩) স্নানের পর পরিষ্কার শুকনো গামছা/তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে নেওয়া দরকার।
৪) স্নানের সময় নরম সাবান ব্যবহার করা উচিত।
৫) ত্বককে সুস্থ ও নীরোগ রাখার জন্য সবসময় পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় ব্যবহার করা উচিত।

চুলের যত্ন — ১) স্নানের শেষে চুলকে শুকনো গামছা/তোয়ালে দিয়ে মুছে জল শুকিয়ে নেওয়া দরকার।
২) মাথায় অত্যধিক তেল দেওয়া উচিত নয়।
৩) সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন চুলে শ্যাম্পু নেওয়া উচিত।
৪) চুলের পুষ্টির জন্য ভিটামিন 'B' যুক্ত খাবার খাওয়া দরকার।
৫) দিনে বেশ কয়েকবার চুলে চিরুনী দেওয়া দরকার।

দাঁতের যত্ন — ১) প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আর রাতে খাওয়ার পর মোট দু'বার দাঁত মাজা উচিত।
২) ব্রাশ করার সময় মাড়ির ভেতর ও বাইরে হালকা সঞ্চালিত করা দরকার।
৩) যে কোনো খাবার খাওয়ার পর দাঁত মাজা উচিত।
৪) দাঁতের ফাঁকের খাবারকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলা উচিত।
৫) দাঁতের মাড়িকে ও দাঁতকে জীবাণুমুক রাখার জন্য মাঝে মাঝে লবঙ্গ খাওয়া যেতে পারে।
৬) দাঁত ভাল রাখতে হলে ভিটামিন 'C' যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

কানের যত্ন — ১) স্নানের সময় কানে যাতে জল না ঢোকে তার জন্য সোজা দাঁড়িয়ে অথবা বসে স্নান করা উচিত।
২) স্নানের পর নরম কাপড় দিয়ে কান পরিষ্কার করা উচিত।
৩) জোরালো শব্দের সময় কানে আঙুল দিয়ে বন্ধ রাখা উচিত।
৪) পেন, পেনসিল, কোনো শক্ত কাঠি বা অন্য কোনো বস্তু দিয়ে কান খোঁচানো উচিত নয়।
৫) মাঝে মাঝে ডাক্তারের কাছে কানের ময়লা পরিষ্কার করানো উচিত।

চোখের যত্ন — ১) প্রত্যহ অন্ততঃ তিন/চারবার ঠাণ্ডা জলে চোখ ধোঁয়া উচিত।
২) চোখ মোছার জন্য নির্দিষ্ট তোয়ালে থাকা দরকার।
৩) চোখে ধুলো-বালি পড়লে জলের ঝাপটা দিয়ে পরিষ্কার করা দরকার, চোখ কচ্‌লানো উচিত নয়।
৪) পড়াশোনার জন্য পর্যাপ্ত আলো থাকা দরকার এবং পরিমিত দূরত্বে বইকে রাখা দরকার।
৫) দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখার জন্য ছোট বয়স থেকেই সমজু শাকসব্জি টাকটা ফল ও ছোট মাছ খাওয়া ভালো।
৬) চোখের কোনো অসুস্থতায় দ্রুত চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত।

নাকের যত্ন — ১) প্রতিদিন স্নানের সময় নাকের ময়লা পরিষ্কার করা উচিত।
২) যদি সবার সামনে নাক পরিস্কার করার দরকার হয়, তবে পরিষ্কার রুমাল ব্যবহার করা উচিত।
৩) দূষণযুক্ত ধোয়া সামনে থাকলে নাক চাপা দেওয়া দরকার।
৪) অযথা নাক চুলকানো বা নাক খোটানো উচিত নয়। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
৫) কোনো বস্তুর গন্ধ পাওয়ার জন্য নাকের খুব কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

নখের যত্ন — ১) নিয়মিত ছোট করে নখ কাটা উচিত।
২) ছোট নখের মধ্যেও যাতে কোনোভাবেই ময়লা না জমে তার প্রতি নজর রাখা উচিত।
৩) খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করা দরকার
৪) দাঁত দিয়ে নখকাটা কখনোই উচিত নয়।

পায়ের পাতার যত্ন — ১) প্রত্যেকবার পা ধোয়ার পর শুকনো পরিষ্কার গামছা/তোয়ালের দিয়ে পায়ের পাতা মোছা দরকার।
২) নখের কোনায় যেন কাদা বা ময়লা জমে না থাকে।
৩) খোলার মাঠে বা স্কুলে যাওয়ার সময় পা-ঢাকা জুতো ব্যবহার করা দরকার।
৪) খালি পায়ে হাটলে নুড়ি পাথর, পিন জাতীয় বস্তু থেকে সাবধানে হাটতে হবে।

নিয়মিত শরীর চর্চা — ১) প্রতিদিন নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করা উচিত।
২) ব্যায়াম করা দরকার খোলামেলা স্থানে।
৩) ব্যায়াম হবে পরিমিত এবং সকাল বা বৈকালে।
৪) ব্যায়ামের পর স্নান করা অথবা গা মোছা দরকার।

জল পান ও মলমূত্র ত্যাগ— ১) প্রতিদিন অন্ততঃ ৪/৫ লিটার জল পান করা উচিত।
২) পানীয় জল, বিশুদ্ধ ও ঠাণ্ডা হওয়া দরকার।
৩) বেশী দৈহিক পরিশ্রমের পর অল্প-লবন চিনি মেশানো পরিষ্কার জল পান করা ভাল।
৪) নির্দিষ্ট স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা উচিত।
৫) মলমূত্র ত্যাগের স্বাভাবিক প্রবনতাকে চেপে রাখা উচিত নয়।

৭.৩.৩ মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health) :

দেহ ও মন নিয়েই ব্যক্তিসত্তা। দেহ নিয়ে যেমন তার দৈহিক স্বাস্থ্য তেমনি মন নিয়ে গঠিত হয় মানসিক স্বাস্থ্য। দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য কোনো বিচ্ছিন্ন অবস্থা নয়। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় পরিবেশের সঙ্গে ও ব্যক্তির নিজের সঙ্গে সার্থকভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার ক্ষমতা। বাস্তব জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েও নতুন ধরনের পরিস্থিতিতে কার্যকরী পদ্ধতিতে সমাজ অনুমোদিত পথে

সমস্যার সমাধান করে একটি আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করাটাই হল মানসিক স্বাস্থ্যের মূল লক্ষণ। কোন ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে কতখানি সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধন করতে পারে সেটাই তার সু-স্বাস্থ্যের পরিচয়। সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্য হল ব্যক্তির দেহ ও মনের সেই সু-সমন্বিত অবস্থা যা তাকে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্মতিবিধান বা অভিযোজনে সক্ষম করে তোলে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির নীতিগুলি যেমন পরিবারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তেমনি বিদ্যালয় পরিবেশেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা অবস্থান করে তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বা স্বাস্থ্যবিধির বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দান করা সম্ভব নয়, কিন্তু পরোক্ষভাবে শিক্ষালাভ বা অভ্যাস গঠন সম্ভব। সেক্ষেত্রে পরিবারের শিশুর পিতা-মাতা এবং বিদ্যালয়ে তার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলি জেনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মূলত পরিবারে শিক্ষার্থীর মা ও বাবা এবং অন্যদিকে বিদ্যানিকেতনে তার শিক্ষক/শিক্ষিকা স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলিকে প্রয়োগ ও শিক্ষার্থীদের পরোক্ষভাবে সু-অভ্যাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দায়িত্ব সচেতনতার পরিচিয় দিতে পারেন। পরিবারে শিশুর মা ও বাবা এবং শিক্ষালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একবার যদি শিক্ষার্থীদের সু-অভ্যাস গঠনে সচেতন করতে পারেন তবে তা-ই একদিন পরবর্তী স্তরের ভিত্তি রচনা করবে।

৭.৩.৪ সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি (Community Health Hygiene) বা জনস্বাস্থ্য :

সমাজ জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ব্যক্তি এবং সমাজ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল, একে অন্যের পরিপূরক। সমাজে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিই অন্যজনকে প্রভাবিত করে আবার প্রতিটি ব্যক্তিই অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে যেমন ব্যক্তিগত প্রভাব দেখা যায় তেমনি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমাজকে যেমন প্রভাবিত করে অর্থাৎ ব্যক্তি গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে তেমনি সমাজও ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ গোষ্ঠী ব্যক্তিজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এই নিয়ম স্বাস্থ্য রক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিটি সমাজ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সমাজজীবনের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে, যেহেতু ব্যক্তি নিয়ে সমাজ। সুতরাং স্বাভাবিক কারণের সমাজের প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সমাজ জীবনের স্বাস্থ্যে প্রতিফলিত হয়। আবার সমাজ জীবনের সামগ্রিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়ন শুধু ব্যক্তিকে ঘিরেই নয় সমাজ জীবনকে ঘিরেও। এই কারণেই ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন একসঙ্গে ভাবনার বিষয়। ব্যক্তির মত সমাজও তার নিজের প্রয়োজনে, নিজের তাগিয়েই স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্বকে গ্রহণ করেছে। সমাজ জীবনের এই স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্বই সামাজিক স্বাস্থ্যবিধিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। ডাঃ বি. এন ঘোষ এর মতে, "when the different measures are applied for the well-being of the community as a whole in an organised manner it is known as public Health or Community hygine." অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে যখন সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাগুলিকে সুসরঞ্জিত ভাবে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে বলা হয় সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি। আবার অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য বা সামাজিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে WHO বলেছেন, "Public Health is the science and the art of preventing disease, prolonging life, and improving health and efficiency, through organised effort."

সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত উপরোক্ত ধারণা থেকে বলা যায় এর উদ্দেশ্য হল সামাজিক কল্যাণ। এর থেকে আমরা কতকগুলি মূল উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে পারি। সেগুলি হল—

১) সমাজ জীবনের অন্তর্গত কোন একজন ব্যক্তির অসর্তকতার জন্য যেন সমাজের অন্যান্য বেশীর ভাগ ব্যক্তিকে তার কু-ফল ভোগ করতে না হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া। সমাজ অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি যাতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে জীবনযাপন করতে অভ্যস্থ হয় তার ব্যবস্থা করা সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য।

২) সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে যুক্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিগুলির উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩) সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির আর একটি উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক নাগরিককে স্বাস্থ্য সম্পর্কে উপযুক্ত এবং সর্বাধুনিক তথ্য সরবরাহ করা এবং সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

৪) বিভিন্ন ধরনের রোগ নিরাময় এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রবর্তন করাও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য। সমাজ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মানুষের রোগমুক্তি প্রসঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫) সমাজ জীবনে যে ধরনের খাদ্য সরবরাহ করা হয়, খাদ্য প্রস্তুত করা হয় সেগুলির স্বাস্থ্যসম্মত গুণমান এবং পুষ্টিমূল্য সম্পর্কে বিবেচনা করা আর একটি উদ্দেশ্য। পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করা এই বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি মেনে চলা দরকার।

১) সমাজ জীবনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত দূষণমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করা সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

২) স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর খাদ্যবস্তু বিক্রয়, ভেজাল যুক্ত খাদ্য সন্ধান ও তার বিক্রয় রোধ এবং অপরাধী বিক্রেতাদের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৩) মল-মূত্র ত্যাগের স্থানকে এবং আবর্জনাযুক্ত স্থানকে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

৪) প্রতিটি বসবাসের গৃহ যাতে আলো বাতাস যুক্ত হয়, পরিচ্ছন্ন থাকে, তার ব্যবস্থা করা।

৫) বিদ্যালয়ে শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্যর পরীক্ষা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬) সমাজ অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।

৭) জনস্বাস্থ্যে বিভাগ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে একত্রে সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির কার্য সম্পন্ন করা যায়।

৮) জনস্বাস্থ্য বা সামাজিক স্বাস্থ্যবিধিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রাচীর পত্র (Poster), বিজ্ঞপ্তি (Handbill) প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেই প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে তথ্য চিত্র প্রদর্শন করানো উচিত।

৯) সংক্রামক রোগ সম্পর্কে জনসচেতন বৃদ্ধি করা, রোগ নিরাময়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০) জনস্বাস্থ্য রক্ষার সঙ্গে দায়িত্ব প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ বিভাগের কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-৬ (Check your progress-6)

নির্দেশ . . . . . .

ক) স্বাস্থ্য শিক্ষার সংজ্ঞা দিন।

খ) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির দুটি উদ্দেশ্য লিখুন।

গ) শিশুকে কেন দাঁতের যত্ন নেওয়া শেখানো দরকার?

৭.৪ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শন

শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শন। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় এই পরিদর্শন প্রক্রিয়াটি বিষয়টিকে দু'টি দিক থেকে দেখা যেতে পারে—

ক) শিক্ষক/শিক্ষিকা দ্বারা দৈনন্দিন স্বাস্থ্য পরিদর্শন

খ) চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরিদর্শন।

ক) শিক্ষক/শিক্ষিকা কতৃক স্বাস্থ্য পরিদর্শন : প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খুব কাছের মানুষ হলেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের দৈনিক তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চোখ, কান, দাঁত, হাত ও পায়ের নখ স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন। লেখা-পড়ার সামগ্রী ওসেই সঙ্গে খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তির কিছু ত্রুটি আছে কিনা তা খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন। দাঁত ও মাড়ির কোন রোগাক্রমন কিংবা খোস-পাঁচড়া, দাদ জাতীয় কোন চর্মরোগে শিক্ষার্থীদের আক্রান্ত হওয়ার কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা তাও দেখা দরকার। এই সমস্ত চর্মরোগের কোন সন্ধান পেলে শিক্ষার্থীদের যেমন সাবধান করে দেবেন তেমনি লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা আক্রান্ত না হয়।

এমন কতকগুলি ব্যাধি আছে যেগুলি তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী সংক্রামক। সেই সব সংক্রমক রোগে যাতে কোন শিক্ষার্থী আক্রান্ত না হয় তা যেমন দেখা দরকার তেমনি যদি আক্রান্ত কোন শিক্ষার্থীর সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয় কতৃপক্ষের নজরে এনে সংবেদনশীল মন নিয়ে, তার রোগমুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরনের সংক্রমক রোগের মধ্যে আছে— হাম, বসন্ত, মাম্পস, ডিপথেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি ইত্যাদি। রোগের লক্ষণ অনুসারে এইসব রোগাক্রান্ত শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে

চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন দরকার তেমনি যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা আক্রান্ত না হয় সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনমন্যতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়, মনমরা নিরানন্দ ভাব, হিংসা, উগ্রতা ও মানসিক উত্তেজনার মত অসুস্থ মানসিকতা দেখা যায়। শিক্ষক শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের এই সমস্ত মানসিক অসুস্থতার লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করে তাদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। এর ভিত্তিতে তা প্রতিকারের ব্যবস্থাও নিতে হবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৬ (Check your progress-6)

নির্দেশ . . . . . .

ক) বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার দুটি দিক কি কি?

খ) শিক্ষক/শিক্ষিকা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য কিভাবে রক্ষা করবেন?

৭.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক জীবন কিভাবে সুস্থ্যতার সঙ্গে শারীরিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক ক্ষমতাকে কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে পারে সেই শিক্ষাই হল স্বাস্থ্যশিক্ষা।

প্রাক প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বয়সে শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত এটাই ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তি।

শিশুর ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। এগুলি হল : স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্বাস্থ্যবিধিতে উৎসাহ প্রদান, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, অভিযোজনে সহায়তা করা ইত্যাদি।

শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির মূলনীতিগুলি মেনে চলা এবং শিশুকে শেখানো জরুরী। এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এই নীতিগুলির মধ্যে প্রধান হল : স্বাস্থ্যরক্ষা ও খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত অভ্যাস, বিশ্রাম ও ঘুম সংক্রান্ত অভ্যাস, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত অভ্যাস ইত্যাদি অত্যন্ত দরকারী। ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে রয়েছে ত্বকের, চুলের, দাঁতের, কানের, চোখের, নাকের, নখের এবং পায়ের যত্ন নেওয়া, নিয়মিত শরীর চর্চা করা, জল পান ও মলমূত্র ত্যাগ করা ইত্যাদি। এর সঙ্গে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করাও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিশুকে কেবল নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা শেখালেই চলবে না এর সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক সমাজের কথাও ধীরে ধীরে ভাবাতে হবে। কারণ পরিবেশ দূষিত হলে, পাড়ায় সংক্রামক অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব হলে তা ধীরে ধীরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই এর জন্যও কতগুলি নীতি মেনে চলতে শিশুকে শেখাতে হবে।

সবশেষে এর প্রসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব এবং কর্তব্য পিতা-মাতার থেকে কম নয়। এর জন্য বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা জরুরী। এর ফলে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশু নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিতে শিখবে এবং ধীরে ধীরে তা অভ্যাসে পরিণত করবে।

৭.৬ অনুশীলনী (Exercise)

ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কাকে বলে?

(ii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির প্রধান দিকগুলি কি কি?

(iii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির যে কোন তিনটি মূল নীতি উল্লেখ করুন।

(iv) মানষিক স্বাস্থ্য কাকে বলে?

খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৩০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি?

(ii) নখের যত্ন নেওয়া জরুরী কেন?

(iii) জন পান এবং মলমূত্র ত্যাগের ক্ষেত্রে শিশুকে কিভাবে অভ্যাস করাতে হবে?

(iv) শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্তৃক বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরিদর্শন করা কেন দরকার?

গ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) প্রাক-প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্যশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

(ii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধির উদ্দেশযগুলি আলোচনা করুন।

(iii) সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি শিশুকে শেখানো দরকার কেন?

(iv) সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি উদ্দেশ্যগুলি কিভাবে পূরণ করা যাবে?

৭.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৬ এবং ৭ এর উত্তর সংকেত

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৬

(ক) স্বাস্থ্যর রীতি-নীতি সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞান।

(খ) স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং স্বাস্থ্যবিধিতে উৎসাহ প্রদান

(গ) দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা বার না করলে পচে গিয়ে রোগ জীবানু জন্মায়।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-এর উত্তর সংকেত-৭

(ক) i. শিক্ষক/শিক্ষিকার দ্বারা দৈনন্দিন স্বাস্থ্য পরিদর্শন এবং

ii. চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরিদর্শন।

(খ) মানসিক অসুস্থতার লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন এবংতার প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেবেন।

পুস্তক তালিকা

১। মুখোপাধ্যায় অমলেন্দু, (২০০৭), প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্ব, কলকাতা : সেন্টাল পাবলিকশিং কনসার্ন

২। চৌধুরী অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণদাস, ঘোষ শান্তনু (২০০৯), সাম্প্রতিক সমাজতত্তব কলকাতা : চ্যাটার্জি পাবলিশার্স

৩। চট্টোপাধ্যায় অমিয় কুমার (১৯৭৮), কোষতত্তব ও জীবতত্ত্ব, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ

৪। ভট্টাচার্য শ্রীনিবাস (১৯৮২), শিক্ষাবিজ্ঞান, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ

৫। বর্দ্ধন, অসীম (১৯৮৯), শিশু কেন শিশু, কলকাতা : প: ব: রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৬। সেন, জ্যোতির্ময় (২০০৪), সমাজ ভূগোলের রূপরেখা, কল্যাণী পাবলিশার্স

৭। সরকার, আর. এম. (২০১১), জৈবিক নৃবিজ্ঞান, কলকাতা : নলেজ হাউস

৮। সরকার, আর. এম. (২০১২), প্রাযোগিক নৃবিজ্ঞান, কলকাতা : নলেজ হাউস

৯। সরকার, আর. এম. (. . . .), সামাজিক সংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান

১০। চট্টোপাধ্যায়, অনীশ (২০০৫), পরিবেশ, কলকাতা : টি. ডি. পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ

১১। সেন, জ্যোতির্ময় (২০১০), জনবসিত ভূগোল, কলকাতা : প: ব: রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ

১২। মাইতি, চঞ্চল কুমার (২০১২), শারীরশিক্ষার সহপাঠ, কলকাতা : ক্লাসিক বুক্স

১৩। লাহিড়ী-দত্ত, কুণ্ডলা, দে বাসুদেব (২০০৬), পরিবেশ সমীক্ষণ, কলকাতা : দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাঃ লিঃ

১৪। গুহ, সুহিতা (১৯৯৪), জীন, বংশধরা ও বিবর্তন (১ম খণ্ড) কলকাতা : পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

১৫। মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় (২০১২), ভূগোলদর্শন, কলকাতা : মিত্রম্

১৬। রায়, সুশীল (২০০৮), শিক্ষামনোবিদ্যা, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

১৭। বসু, অমরেন্দ্র নাথ (১৯৯৫), শিশুমনের বিকাশ ও বিকার, কলকাতা : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

১৮। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু (১৯৯০), সমাজ মনোবিজ্ঞান, কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স

১৯। রায়, সুশীল (২০০৫-০৭), শিক্ষাতন্ত্র, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

২০। হালদার, গৌরদাস ও শর্মা প্রশান্ত কুমার (২০০০), শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষানীতি কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স

২১। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু ও শর্মা, প্রশান্ত কুমার (১৯৯৮), শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স

২২। Panda, K.C. (2012), Elements of Child Development, Kolkata; Kalyani Publishers

২৩। Dutta, Sukanya. (2003) Social Life of Animals, New Delhi National Book Trust of India.

২৪। Aggarwal, J.C. (2008) Educational Reforms in India, Delhi : Shipra Publications

২৫। Smith, E. Edward : Kosslyn, M. Stephen. (2011) Cognitive Psychology Mind and Brain, New Delhi : PHI Learning Private Limited

মূল্যায়ণ

১। রায় সুশীল (২০০৫) মূল্যায়ণ নীতি ও কৌশল, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

২। রায় সুশীল (২০০৪) শিক্ষানীতি, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

৩। চক্রবর্তী অনুরুদ্ধ, ইসলাম মহ: নিশাইরুল (২০১১) শিক্ষক শিক্ষণ, মূল্যায়ণ, কলকাতা : ক্লাসিক বুকস্

৪। ঘোষ, রণজিৎ (১৯৯৮), শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

৫। শর্মা, প্রশান্ত কুমার (২০০২), শিক্ষায় মূল্যায়ণ ও নির্দেশনা, কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স